যোগিনীর মাঠ

শ্রীতারাপদ রাহা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা

এই গ্রন্থের প্রতিটি কাহিনীর পটভূমি আমার গ্রাম শ্রীকোল,—যশোহরের মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত। গল্পগুলি একত্র সন্নিবেশের ইহাই একমাত্র কারণ।

গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছি, কিন্তু গ্রামকে ভুলিতে পারি নাই,—কেহই পারে না: মাকে ছাড়িয়া সন্তান যতদিন যতদূরেই থাকুক না কেন মা তাহার তবু সেই মা-ই থাকিয়া যায়।

দূরে থাকিয়া গাঁয়ের মা-টির স্বপ্ন দেখি: মনে পড়ে তার গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা। 'যোগিনীর মাঠ' গল্পটি এইরূপ এক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

'জাগুলি ধানের ক্ষেত', 'যশো'রের কালু মিঞা', 'স্বর্গ হইতেও—' ও 'মহাষ্টমী' গল্পের নায়ক-নায়িকা আমারই গ্রামের নরনারী,—দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাংখা হিংসা-দ্বেষ ভুল-ভ্রান্তিতে গড়া সাধারণ মানুষ। গল্পের অন্তর্নিহিত সত্য আমার প্রত্যক্ষীকৃত।

বাংলার গ্রাম প্রায় সকলই একরূপ, সুতরাং আশা করি যোগিনীর মাঠের আশেপাশে অনেকেই অনেক পরিচিত জনের ছবি দেখিবেন।

কথা ভবন
২৭-২-৩ কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ
কলিকাতা

দোলপূর্ণিমা
১৩৪৮

শ্রীতারাপদ রাহা

যোগিনীর মাঠ

গ্রামের শেষ প্রান্তে বুড়ো-বটতলায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়,—সমুদ্র বীচিবিক্ষোভিত লবণাম্বু-রাশির নয়, কখনও কমল-কুমুদপরিশোভিত কাক-চক্ষু স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের, কখনও সোনার বরণ ধানের, কখনও মটর-মসুর যব-গমের স্নিগ্ধ-শ্যামল সমারোহের। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে মাঠ দূরে, আরও দূরে গিয়া আকাশের সঙ্গে মিতালি করিয়াছে। চক্ষুকে বিশেষ ভাবে নির্যাতন করিলে শুধু একটা অতিনিম্ন কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীরের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়, সমুদ্র পার হইয়া উহার নিকটে পৌঁছিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা প্রাচীর নয়, আম-জাম-তাল-খর্জূর-বংশ-পরিবেষ্টিত গ্রামের সূচনা।

দূর হইতে এই সমুদ্রের মাঝে ছোট বড় দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা চাষী নমঃশূদ্র পল্লী। বর্ষার জলে বিলের জল বাড়িয়া যখন মাঠ সত্যই সমুদ্র হইয়া উঠে, তখন এই উচ্চ ভূভাগগুলি ঠিক দ্বীপের মত দেখায়। দুই তিন মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এই দ্বীপের মত গ্রামগুলির একটি হইতে আর একটিতে যাইতে হইলে, তখন নৌকা বা 'ডোঙ্গা' ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু নৌকা-চালনায় ইহারা সিদ্ধহস্ত। তীরের মত লম্বা নৌকায় যখন পাঁচ ছয়জন আরোহী মালকোঁচা মারিয়া, বৈঠা ফেলিয়া শব্দ করিয়া চলে, তখন দূর হইতেও লোকের সন্ত্রস্ত হইতে হয়। মাঝে মাঝে পনের বিশখানা নৌকা একসঙ্গে বাহিয়া চলে—হয়তো সে কিছুই নয়, উহারা শ্রীকোলের বা আবাইপুরের হাট করিয়া ফিরিতেছে, তথাপি কাহারও নৌকা বিলের মাঝে থাকিলে লোকের প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে: এই দুই মাস আগে ভীম মণ্ডলের দল ছাড়া পাইয়া আসিয়াছে।

বর্ষার অন্তে ইহারা এই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে সোনার ফসল ফলায়। লাঙ্গলের ফলার আঘাতে তাহারা নিজেদের শৌর্যের পরিচয় দেয়, ক্ষেত নিড়াইতে নিড়াইতে তাহারা এক সঙ্গে গান ধরে—

চাঁদের নাহাল মুখ রে কন্যার, পায়ে পড়ে কেশ,
বন্ধু, আমায় নিয়ে চলো, সেই চন্দ্রাবতীর দেশ।

মাঠের বিস্তৃত ভাগাড়ের পথে যাইতে যাইতে ইহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের প্রেমগীতি আপনার দাঁড়াইয়া শুনিতে হইবে। বাড়ি যদি আপনার কাছের কোন গ্রামে হয়—তবে আপনার ভয় নাই, ইহাদের কাছে আগাইয়া যাইবেন। গান শেষ হইলে ইহারা আপনাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইবে। দেবদাসপুরের জমিদারীর এলাকায় বসতি করে, এমন কোন লোকের ইহাদের কাছে কিছু ভয় করিবার নাই। কেন নাই, তাহা লইয়াই আমার এ কাহিনী।

প্রায় একশত বৎসর আগেকার কথা। কুমারের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া নব-গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। নব-গঙ্গার অপর পারেও তখন ভাল করিয়া চাষ আবাদ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু সে কথা আমরা ভাল করিয়া জানি না। গ্রামের বুড়োবুড়ীদের কাছে শুনিয়াছি 'যোগিনীর মাঠ'এর কথা,—যে মাঠ কুমার হইতে আরম্ভ করিয়া নব-গঙ্গার তীরে গিয়া মিশিয়াছে।

যোগিনীর মাঠের পূর্ব নাম ছিল 'গড়ের মাঠ'। এখনও ইহার এক অংশের নাম গড়ের মাঠ। গড় আর এখন নাই, কিন্তু মাঠে চাষ করিতে চাষীদের লাঙ্গলের ফলা এখনও মাঝে মাঝে কিসে লাগিয়া ঠং করিয়া বাজিয়া ওঠে! বিশ বছর আগেও নাকি এই মাঠে চাষ

করিতে করিতে কুড়ান মণ্ডল দু'ঘড়া মোহর পাইয়াছিল। তাহার সন্তানেরা পাকা বাড়ি করিয়া দুধে ভাতে আছে।

গড়ের মাঠ এখন সবুজে, হলুদে, নীলে—চাষীর মনে স্বপ্ন জাগায়। কিন্তু তখন ছিল ঘন বন, নল-খাগড়া, হিজল গাছের ঘন জটলা। পাশের গাঁয়ের কেহ ভয়ে কাছে ঘেঁষিত না। কবে কোন্ হীরুদাস—গরুর জন্য ঘাস কাটিতে গিয়া 'বোনোলা' মহিষের কবলে পড়িয়াছিল এবং কেমন করিয়া সেই বীর হীরুদাস সেই ভয়ঙ্কর মহিষাসুরের শিং ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, মহিষ দৌড়াইতে থাকিলে সে কি করিয়া এক হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আর এক হাতে কাস্তে দিয়া তার গলা কাটিয়াছিল, গ্রামের ঠাকু'মাদের কাছে সবিস্তারে তাহা এখনও শুনিতে পাইবেন। মহিষটা না কি বুড়ো বটতলা আসিয়াই হুমড়ি দিয়া পড়িয়াছিল।

মাণিক মিস্ত্রী এখন থুড়থুড়ে বুড়া হইয়াছে। তাহার কাছে গেলে শুনিবেন—তাহার এক কাকা জোয়ান্ বয়সে গড়ের মাঠে কাঠ কাটিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। ভাঙ্গা কুঠীর ধারে সর্দারপল্লীতে গেলে শুনিতে পাইবেন, বাদল সর্দারের ঠাকুরদাদার ছোট ভাই নাকি বরাহশিকারে গিয়া গড়ের মাঠ হইতে আর ফেরে নাই। বুনো মহিষ ও শূকরের সাথে বাঘেরও অভাব ছিল না বটে এ বনে: নলডাঙ্গার রাজা হাতীতে চড়িয়া শিকার করিতে আসিতেন, কিন্তু বুড়ো মাণিক ও বাদলের কাছে শুনিবেন, তাহাদের খুড়ো-ঠাকুরদাদাকে খাইয়াছে জঙ্গলের বাঘে নয়: কথাটা উচ্চারণ করিতে গিয়া তাহারা রাম নাম একশো আট বার উচ্চারণ করিয়া লয়, তারপর চোখ বুঁজিয়া বিড়বিড় করিয়া ইঙ্গিতে বলে,—নেছে—ওই তো বাবু, তোমরা বিশ্বেস করো না! নেকাপড়া করে তোমরা লায়েক হোইছো, কিছুই বিশ্বেস

করতি চাও না। কত রং বেরঙের ছিল জান? আমাগারে মুনিব বিষ্টু ঠাকুরের ঠাকু'মা ঐ বুড়ো-বটতলা একবার পূজো দিতি গিছ্‌লো, তেনার সাথে দেখা হইছিল এট্‌টির—রাম রাম,—তার মাথা নাই, বুকের উপর আছে চোখ-মুখ আর দাড়ি—পা আর হাত পিছনের দিক ফিরেনো।

তাহাদের কথা শুনিয়া আপনি যদি না হাসেন, তাহা হইলে শুনিবেন, এই সব বিদেহীদের সকলের আকার এমন কিম্ভূত-কিমাকার নয়, কেহ কেহ আবার পরম রূপসী নারী,—নাম তাদের পরী। ইহারা কাহারও প্রতি সুনজর দিলে তার পরম মঙ্গল হয়: ধন, ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য, সুন্দরী স্ত্রী সকলই লাভ হয় তার। উহাদের মুখেই শুনিবেন, মাণিক মিস্ত্রীর খুড়া আর বাদল সর্দারের ঠাকুরদাদাকে লইয়াছে এই পরীতেই। কোন্ দেশে উড়াইয়া লইয়াছে তার ঠিক কি? কথা-প্রসঙ্গে শুনিবেন এই যোগিনীর মাঠের ইতিহাস:

ক্যান্ বাবু,—এই যুগ্গির মাঠ্‌টা ক্যামন্ ক'রে হলো, এ গ্রামটা ক্যামন্ ক'রে হলো, এ্যহানে দেবদাস পুরের জমিদারী ক্যামন্ ক'রে হলো? যশোর জেলার কোন জমিদার, এমন কি নলডাঙ্গার রাজা পর্যন্ত, যে বন কিন্‌তি সাহস করলো না, নদে জেলার থে' জমিদার আ'সে স্যাহানে তাজ্জব ব্যাপার বানায়ে দিলো, বাবু!

এই তাজ্জব ব্যাপারের অনেক আশ্চর্য কথা আপনার কানে আসিবে. বুড়াদের কেহই তাহাতে পরীর অনুগ্রহের কথা আরোপ করিতে ছাড়িবে না, কিন্তু সে সব ভৌতিক ব্যাপার একেবারে উড়াইয়া দিলেও, যে কাহিনীটা আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়ায়, সেটিও কম রোমাঞ্চকর নয়।

জমিদার দেবদাস রায় লেখাপড়া কতদূর জানিতেন, সে খবর কেহ

জানে না, কিন্তু অত বড় লাঠিয়াল, অত বড় জোয়ান না কি আজকাল আর দেখা যায় না। রূপও ছিল তাঁহার দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের মত, একবার যে দেখিয়াছে সে আর ভোলে নাই। পরিণত বয়সেও জন্মাষ্টমীর লাঠিখেলার প্রদর্শনীতে মিন্ গ্রামের এক শত লাঠিয়ালের আক্রমণ হইতে লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তিনি লাঠি ঘুরাইতে থাকিলে তাঁহার গায়ে নিক্ষিপ্ত বর্শা বা লাঠি একটিও তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই, বরং তাঁহার লাঠির কৌশলে নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। তাঁহার সময়ে এ তল্লাটের বড় বড় সর্দার লাঠিয়াল তাঁহার পায়ে লাঠি রাখিয়া 'গুরুজী' বলিয়া প্রণাম করিয়াছে।

গড়ের মাঠে তাঁহার জমিদারীর প্রথম পত্তনের কথা লোকে এখনও গল্প করে। কাজলীর হাট করিতে যাইতে 'হাটুরে' নৌকা একদিন দেখিতে পাইল, কুমারের দক্ষিণ তীরে গড়ের মাঠের এক অংশ পরিষ্কার করা হইতেছে।

কি, কি, কি হচ্ছে ওহানে!—বৈঠা মারিতে মারিতে কেহ জিজ্ঞাসা করিল।

—যাবেন বাঘের প্যাটে, বোনোলা মোষির শিংইর গুঁতোয় অক্কা পাবেন—কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল।

রাত্রে হাট হইতে ফিরিবার পথে দেখা গেল, কুমারের সেই নির্জন অরণ্যময় তীরে আলো জ্বলিতেছে। এই ভয়ংকর স্থানের পাশ দিয়া নৌকা চালাইতে সেদিন তাহাদের গা ছম্‌ছম্ একটু কম করিল। বাড়ি গিয়া তাহারা গ্রামের লোকের কাছে গল্প করিল, এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা। গ্রামের লোক হাসিয়া উঠিল : তোরা পাগল হইছিস্! ভূতি আলো জ্বালিছে ওহানে, ও 'আলো-ভুলো'র কাণ্ড!

—কিন্তু জায়গা সাফ করতিছে যে!

—ও তোমাগারে চোখির ভুল, ওরা অমনি করেই তো ধাঁধা লাগায় চোখি!

তারপর একটু থামিয়া বলিল, তা' না হ'লি কুমোরের ধারে গড়ের মাঠে জা'গা সাফ হয়? বোলে—নলডাঙ্গার রাজা মহারাজ হার মানে' গেল, তা, এ তো কন্‌কার কেডা!…ক্ষেপলি না কি তোরা?

কিন্তু পরের হাটে নৌকা বাহিয়া যাইবার সময় দেখা যায়, তাহারা ক্ষেপে নাই। কুমারের ধারে সেই নির্দিষ্ট স্থানের জঙ্গল আরও পরিষ্কার করা হইয়াছে। কুলিদের থাকিবার জন্য একটা চালা বাঁধা হইয়াছে, ভদ্রবেশী একজন লোক, বোধ হয় গোমস্তা হইবে, একটা জলচৌকীতে বসিয়া তামাক খাইতেছে আর তদারক করিতেছে।

নৌকার বৈঠা ফেলিতে ফেলিতেই কৌতূহলী হাটুরে নৌকার লোক জিজ্ঞাসা করিল, এ্যহানে কি হবে গো?

কাচারী।

কাচারী!

হাঁ।

কন্‌কের কাচারী?

হুঁকার ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে গোমস্তাবাবু উত্তর দিলেন, নদে জেলার ইস্‌লামপুরির গো, জমিদার দেবদাস রায়ের কাচারী।

চঞ্চল বৈঠাগুলির আলোড়ন মুহূর্তের জন্য থামিয়া যায়: "কন্‌কের জমিদার কলেন?"

ইস্‌লামপুরির।—গোমস্তা হাসিয়া বলিলেন: তোমাদের হাট ক'রতে আর অতদূর যেতে হবে না।

হাটুরে নৌকার লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ওঠে: অত সুখ আর খাবেন না মশায়, আগে প্রাণডা নিয়া ফিরে যান!

গোমস্তা আর একবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলে, আচ্ছা দেখা যাক্।

তিন চারটা হাটবারের পর যাহা দেখা গেল, তাহাতে হাটুরে নৌকার আরোহীদের মনে হইল, গোমস্তার কথা সত্য হইতেও বা পারে। কুমারের তীরে এই নির্লক্ষ্যের চরে পাকা বাড়ি করিবার সকল সরঞ্জামই আনা হইয়াছে, নৌকাভর্তি চূণ-সুরকী রহিয়াছে, নদীর তীরে পরিষ্কৃত জায়গায় ইঁটের গাদা করা হইয়াছে। ভদ্রবেশী আরও দু'চারজন লোক ঘোরাফিরা করিতেছে, কুলির সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ঘাটে একখানা সুদৃশ্য বজরা বাঁধা রহিয়াছে।

হাট করিয়া রাত্রে ফিরিবার পথে হাটুরে নৌকার লোকেরা সেখানে তামাক খাইতে নামে ঃ

তা'লি পাকা বাড়ি হল, বাবু ?

হুঁ, বলিয়া গোমস্তা রাখালবাবু কলিকা বাড়াইয়া দেন—ঃ এখানে হাটও বসবে, তোমরা সব এখেনে হাট ক'রতে আসবে।

সেদিন আর হাটুরে লোকে সে কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল না, বলিল, হাট তো করবেন, কাচারীও বসালেন, কিন্তু প্রজা পাবেন ক'নে ?

—প্রজা বসান হবে এই জঙ্গল কেটে।

হাটুরিয়াদের দুই চোখ কপালে উঠিয়া যায় ঃ কি কলেন ?

গোমস্তা হাসিয়া বলেন, এ জঙ্গল সাফ করা হবে।

ঐ কাজডা করতি যাবেন না বাবু, বাপের দেওয়া প্রাণডা হারাবেন, নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর নিতি সাহস পান নি এ জঙ্গল —বলিতে বলিতে তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠে।

গড়ের মাঠের রহস্যময় ভীষণতাকে তাহারা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে, ইহার অপরাজেয়তা লইয়া তাহারা গর্ব করে। কোন দুর্ধর্ষ সুন্দরী

কন্যাকে যেন তাহারা পরম স্নেহে পালন করিয়া আসিতেছে, বাহু বলে কোন বীর তাহার কৌমার্য-ব্রত ভঙ্গ করিয়া ঘরণী করিয়া লইবে, এ তাহারা সহ্য করিতে চাহে না। কলিকায় টান দিতে দিতে তাহারা বলে, আপনাগারে বাবু আনবেন কবে ?

কোন্ বাবু ?

জমিদার বাবু গো, যিনি এই তালুক কিনিছেন।

আসবেন শীগগিরই, দেখ না—বজরা পাঠিয়েছেন !

ঐ নৌকোয় থাকবেন বুঝি তিনি ?

হাঁ, যতদিন কাচারী বাড়ি তৈরী না হয়।

বজরা তো আ'সে গেল, তিনি আ'লেন না যে ! কিসি আসবেন তিনি ?

তিনি ঘোড়ায় আসবেন। ঘোড়ায়ই তিনি সব জায়গায় যান; যেখানেই যান আগে বজরা যায়, তারপর ঘোড়ায় চড়ে তিনি আসেন।

লোকগুলির কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল : তা'লিই হইছে !

কেন ?

ঘোড়ায় চড়ে তিনি আসবেন কোন পথে শুনি ? দেখতি পাচ্ছেন না, নদীর ধারে মানুষ যাবার পথ নেই। এ্যহানকার লোক-জন নৌকায় যাতায়াত করে। ডাঙ্গার পথ থাকলি কি আমরা এমনি দাঁড় ঠেলে গা ব্যথা করি ?

কথাটা অতিরঞ্জিত নয়, কুমারের ধারে নলখাগড়ার বনের ভিতর দিয়া কেহ পথ রচনা করিতে সাহস পায় নাই। বন্য শূকর, মহিষ, অজগরের উপদ্রব আর ভূতের ভয়ে গড়ের মাঠের কিনারা কেহ মাড়াইতে সাহস পাইত না। ভাঙ্গা কুঠীর ধারে কাঠ কাটিতে মাঝে মাঝে লোক আসিত, তাহাদের পায়ে পায়ে—মাঝে মাঝে ছোট সংকীর্ণ

পথ দেখা যাইত, বর্ষার জলে সে পথ মিলাইয়া যাইত। যাহারা কাঠ কাটিতে গভীর জঙ্গলে যাইত, তাহাদের কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত, জঙ্গলে বসতি আছে, লোকের পায়ের চিহ্ন নাকি পাওয়া যায়। ভয়ে কিছুদিন আর কেহ জঙ্গলে ঢুকিত না। রাজা বাহাদুর যখন শিকারে আসিতেন, তাঁহার দলবলের সহিত অনেকে জঙ্গলে ঢুকিয়া এই ভৈরবীর হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করিয়া আসিত, সেখানে পশুর আস্ফালন অত্যধিক, কিন্তু মানুষের গতিবিধির কথা একেবারেই মিথ্যা।

লোকে বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও দেবদাস বাবু একদিন সত্যই ঘোড়ায় চড়িয়া এই জঙ্গলের পথে আসিলেন, সঙ্গে চারজন মাত্র অশ্বারোহী লাঠিয়াল। ঘোড়া হইতে নামিয়াই দেবদাস বাবু বলিলেন, ভাল শিকারের জায়গা পাওয়া গেছে, কি বলিস রে শিবু ?

শিবু তার বাবরী চুল দোলাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল হেঁ বাবু, একদিন যাব আমরা শিকারে।

শিবু ও তার বাবু তখনও ঘামে স্নান করিয়া উঠিতেছেন। গোমস্তা বাবুর হাতে পাখা দিয়া বলিলেন আগে বিশ্রাম করুন, তারপর শুনবেন এখানকার বনের কথা, এখানে শিকারে যাওয়া হবে না আপনার।

ভ্রূ কোঁচকাইয়া দেবদাস বলিলেন, কেন ?

এখন নয়, আগে আহারাদি ক'রে বিশ্রাম করুন, তার পর শুনবেন সে সব কথা।

স্নানাহার ও বিশ্রামের পর গোমস্তা যখন লোকমুখে শোনা বনের গল্প দেবদাস বাবুর কাছে সবিস্তারে বলিলেন, দেবদাস তো হাসিয়াই অস্থির :—শুনেছিস্ রে, শুনেছিস্ শিবু ? তোদের রাখাল বাবুর কথা শুনেছিস্ ! কালই তোমার ভয় ভেঙ্গে দিচ্ছি···কালই শিকারে যাচ্ছি। কি বলিস্ রে শিবু ?

দীর্ঘপথ অশ্বচালনা করিয়া শিবুর গায়ে ব্যথা হইয়াছিল, সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, তবু বাবুর উৎসাহ-দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সে না বলিতে পারিল না। সে একবার বাবুর দিকে, একবার রাখালের দিকে চাহিতে লাগিল : বনের অবস্থা সে দেখিয়া আসিয়াছে, চার জন মাত্র লাঠিয়াল সঙ্গে করিয়া এই বনে শিকার করিতে যাওয়া যে নিতান্তই দুঃসাহস, এ কথা সেও বোঝে। অথচ বাবুর একটি প্রস্তাবের যে কি মূল্য, তাহাও তার অজানা নাই।

সকলের চেয়ে বেশি মুস্কিল গোমস্তা রাখালের। দেবদাস বাবুর মায়ের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বাবুর আপদে বিপদে দেখাশুনা করিবেন। রাখালবাবু অনেক দিনের বিশ্বাসী কর্মচারী, মা ঠাকুরাণীর তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস। তাই এই জমিদারী পত্তনের কাজে নায়েবকে রাখিয়া রাখালকে পাঠানো হইয়াছে। রাখাল বাবু সে বিশ্বাসের উপযুক্ত মর্যাদা রাখিতে চা'ন। এতদিন ধরিয়া দিনের পর দিন তিনি বনের রহস্যের কথা শুনিয়া আসিতেছেন, নিজে হয় তো তাহার অধিকাংশ কথাই বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিপদসংকুল বনে বাবুকে তিনি কিছুতেই পাঠাইতে পারেন না,—বিশেষত বাবু খেয়ালী। ছেলে বেলায় লেখাপড়ার চেয়ে লাঠিখেলা, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়াতেই ছিল তাঁহার আসক্তি ; তাহার পর বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চার বৎসর কাটাইয়া সবে এক বৎসর হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনও যোগাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কি সব করেন। মা বিবাহের কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাবু কিছুতেই রাজি ন'ন। তবু মন্দের ভাল, জমিদারীতে মন দিয়াছেন। ছেলেবেলার লাঠিখেলার সাথীদের ধরিয়া আনিয়া কাছারীতে পেয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ইস্‌লামপুর কাছারীতে সকল পেয়াদাই

লাঠিয়াল। দেবদাস অনেকবার তাঁহার মাকে বলিয়াছেন, কি হবে মা বিয়ে ক'রে, এত সন্তান আমার, এদের পালন ক'রতে হবে না!

মা স্থন্দরী পুত্রবধূর স্বপ্ন ভুলিতে না পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন: ছেলে তো তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে!

রাখাল বাবু এ সব নিজের চোখে দেখিয়াছেন, চারবৎসর ধরিয়া মা ঠাকুরাণীর চোখের জলও দেখিয়াছেন, স্থতরাং তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন, এখানে শিকারে যাওয়া আপনার হবে না, বাবু।

কেন?

এখানকার জঙ্গলটা বড় ভাল নয়, তা ছাড়া এ তো আর বাদা নয় যে হরিণ মেরে খাবেন? এখানে যা পাওয়া যায় তার কিছুই আমাদের খাদ্য নয়।

যথা?

যথা—মোষ, বুনো শুয়োর, বাঘ, সাপ—

তারপর?

তা' ছাড়া আরও অনেক ভয়ের কিছু না কি আছে, লোকে বলে।

দেবদাস হাসিয়া উঠিলেন,—তোমার ভয় এখানেই বেশী, তা বুঝতে পেরেছি! তুমিও বোধ হয় প্রজাদের মত মনে কর পরীতে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে!

রাখাল বাবু অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, নাই বা গেলেন এত তাড়াতাড়ি, জানোয়ারের ভয় তো আছে, আর বেশি লোকজনও এখন সঙ্গে নেই।

তা হয় না রাখাল, একবার যা আমি মনে করি তা' আমি

করি, আর যে কাজে যত বিপদ বেশি, দেবদাস রায়ের সেই কাজ করতে আগ্রহ আর আনন্দ তত বেশি।

রাখাল বাবু সে কথা জানিতেন, আর জানিতেন বলিয়াই তিনি ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, মা ঠাক্রুণের কাছে আজই লোক পাঠাচ্ছি আমি!

দেবদাস রাখাল বাবুকে ডাকিলেন, এদিকে এস।

রাখাল বাবু আগাইয়া গেলেন।

দেবদাস তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমার কাছে তোমার কোন শাস্তি পেতে অপমান আছে?

রাখাল বাবু বলিলেন, না।

দেবদাস তাঁহার হাতে একটু চাপ দিতেই, উঃ উঃ লাগে!—বলিয়া রাখাল বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

দেবদাস হাসিয়া উঠিলেন, এমনি করে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব, যদি মায়ের কাছে লোক পাঠাও। আমাকে কি তুমি আটাশে পেয়েছ না কি, যে বোন্‌লা শুয়োর আর মোষের ভয়ে মূর্ছা যাব?

মা ঠাকুরাণীর কাছ হইতে এতদূরে তাহার পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে নিরুপায় রাখাল বাবুর চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। বাবুর যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে মা ঠাকুরাণীর কাছে তিনি কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন!

পরদিন অতি ভোরেই শিকারের আয়োজন চলিতে লাগিল। চার জন ছাড়া লাঠিয়াল সঙ্গে ছিল না, রাখাল বাবু বলিলেন, যদি বলেন তো ওপার থেকে দু'চারজন সর্দার এনে দি—ওরা ঐ বনে মাঝে মাঝে শূয়োর মারতে যায়।

দেবদাস হাসিয়া বলিলেন, তার আর দরকার নেই, যদি দু'একটা শূয়োর মারতে পারি, তাহলে বরং ওদের খেতে দেওয়া যাবে।

শিবু ও পঞ্চু সে কথায় সায় দিল। মহিষ শিকারেই তাহাদের বিশেষ ঝোঁক, বাবুর সঙ্গে থাকিয়া দু'চারটা বাঘ মারিয়াও তাহারা হাত পাকাইয়াছে, শুধু শিকারের আনন্দ ছাড়া শূকর মারিয়া তাহাদের কিছুমাত্র লাভ নাই, শূকর পাইলে তাহারা সর্দারদেরই দিয়া দিবে।

কাঠের উপর বালি দিয়া ঘষিয়া বর্শাগুলি ধারাল করিয়া তোলা হইল, বাবুর বন্দুকটা তেল দিয়া পরিষ্কার করা হইল।

নদীর ধার হইতেই ঘন জঙ্গলের যে ক্রম দেখা যায়, তাহাতে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যাওয়া অসম্ভব। সকালে কিছু জলযোগ করিয়া সকলে পায়ে হাঁটিয়া শিকারে রওনা হইল। রাখাল বাবু তাঁহার চাদরের ভিতর হাত রাখিয়া ঘন ঘন দুর্গানাম জপ করিলেন।

বনে ঢুকিয়া আধ মাইলের ভিতর বিশেষ কিছু মিলিল না। গাছে গাছে দু'চারিটা পাখী, কাঠবিড়ালী, বেজী, সজারু এই কেবল জানোয়ারের নমুনা। শিবু হতাশ হইয়া বলিল, বাবু মিছেই হয়রান্ হচ্ছি আমরা, ফিরে চলুন।—কিন্তু বাবু নিরুৎসাহ হইলেন না, একটু আগে কচু বনে তিনি শূকরের পায়ের চিহ্ন দেখিয়াছেন। বাঙ্গা চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবু ঐ যে নদী দেখা যায়!

দেবদাস তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন। শিকারে বাহির হইয়া এমন করিয়া দিক্ ভুল তাঁহার এই প্রথম। বুঝিলেন, এই জন্যই জানোয়ারের দেখা পাওয়া যাইতেছে না : ওপারের সর্দারদের ভয়ে দিনের বেলা তাহারা নদীর গা ঘেঁষে না। দেবদাস এইবার দিক্ ঠিক করিয়া দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেন। বাবলা, 'পিঠেপোড়া', খেজুর গাছ অগ্রসর হইতে

পথ দেয় না।—একটা সজারু ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া পালাইতেছিল, বংশী বর্শা দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। নিধিরাম বলিল, মাছি মেরে হাত কালো করলি, বংশী!

কিন্তু আর মাছি মারিতে হইবে না, তাহাদের সম্মুখ দিয়া তিন চারিটা বড় শূকর পাশ কাটাইতেছিল, দেবদাসের বন্দুক হইতে গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটি শূকর আর্তনাদ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। বংশী চীৎকার করিয়া উঠিল: বাবু সাবধান!

দেবদাস দেখিলেন, সকলের চেয়ে বড় শূকরটি তীর বেগে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। দেবদাস গুলি করিতে যাইতেছেন, এমন সময় শিবু এক লাফে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া বর্শাটা একেবারে সোজা করিয়া ধরিল, চোখ দুটা যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইতে চায়। শূকরটা ছুটিয়া একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলে শিবু তাহার বর্শার অগ্রভাগ শূকরের গ্রীবার নিম্নে বক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে ন্যস্ত করিল, একটু বলও সে প্রয়োগ করিল না। কি আশ্চর্য! জানোয়ারটা একটু সরিল না, এই সুতীক্ষ্ণ বাধার পথেই শিবুকে আক্রমণ করিতে ছুটিল! দেখিতে না দেখিতে শিবুর বর্শাটা তাহার বক্ষদেশ ভেদ করিতে চলিল, তখন দুই দিক হইতে পঞ্চু ও বংশীর আরও দুইটা বর্শা আসিয়া শূকরটার সকল যন্ত্রণা শেষ করিয়া দিল।

গ্রামের কোন জঙ্গলে এ শিকার হইলে রক্ষার জন্য একটি লোক রাখিলেই চলিত, কিন্তু এ ভীষণ অরণ্যে, যেখানে প্রতি পদেই মানুষের জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেখানে একটি লোককে প্রহরী রাখিয়া যাওয়া চলে না; আর শূকর যদি রাখিয়াই যাইতে হয়, তবে শিকার করিয়া লাভ কি? সুতরাং ঠিক হইল বংশী ও পঞ্চা দুইটি মৃত শূকর

রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে, দেবদাস বাবু শিবু ও পঞ্চুকে লইয়া বড় শিকারের সন্ধানে আগাইয়া যাইবেন। বাঘ পাইলে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইবে, মহিষ পাইলে বাসায় গিয়া আরও লোক পাঠাইতে হইবে।

পায়ের চিহ্ন দেখিয়া দেবদাস বাবু বুঝিয়াছেন, এ বনে বাঘ ও মহিষ আছে। বাঘ-শিকার জীবনে তিনি করিয়াছেন নিতান্ত কম নয়, কিন্তু মহিষ-শিকারের সুযোগ জীবনে তাঁহার আর আসে নাই। মহিষের পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া তিনি দেখিলেন, একটা জায়গায় কয়েকটি মহিষ হয় তো ঘাস খাইতে উঠিয়া আসিয়াছিল, সেখান হইতে তাহারা যে দিকে চলিয়া গিয়াছে সে দিক ক্রমশ ঢালু হইয়া গিয়াছে। নল খাগ্ড়ার বন ঘন হইতে ক্রমে ঘনতর হইয়া অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। জলাটার ধারে ধারে হিজলের বন সেগুলিও এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, মানুষের কথা দূরে থাকুক, পশুদেরও সে পথে যাওয়া দুঃসাধ্য। দূর হইতে মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট কর্কশ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, দেবদাসের মনে আশা হইল, কিছু আগাইয়া গেলে হয়তো ভাল শিকার মিলিবে। পঞ্চু ও শিবুকে সঙ্গে লইয়া জলার ধারে ধারে হিজল বনের পাশ দিয়া তিনি ক্রমে দক্ষিণ দিকে আগাইয়া চলিলেন। দূরে অস্পষ্ট গর্জন বা কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছু নাই। জলাটা যেন ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে, আর একটু আগাইয়া গেলেও যদি মহিষ দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে আশা ত্যাগ করিতে হইবে,—আবার কতটা পথ অতিক্রম করিলে অন্য জলার সন্ধান মিলিবে, তাহাও বলা যায় না। দেবদাস আকাশে সূর্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইতে চলিল, আর একটু পরেই হয়তো ফিরিয়া যাইতে হইবে, দেবদাস আরও কত কি ভাবিতে যাইতেছিলেন, সহসা শিবু বলিয়া উঠিল : বাবু দেখুন—মানুষের পায়ের দাগ্ !

দেবদাস দেখিলেন, সত্যই তাই। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত, একটা হিজল-গাছের নীচে কে যেন তামাক খাইয়া ছাই ফেলিয়া গিয়াছে, দাগ খুঁজিতে গিয়া শিবুই তাহা আবিষ্কার করিল। দেবদাস দেখিয়া বলিলেন, অন্য কোনও দল হয়তো শিকার করতে এসে থাকবে।

শিবু আশ্চর্য হইয়া বলিল, অন্য লোকেও এখানে শিকার ক'রতে আসে ?

আসে বই কি ?

আর তাদের আসতে দেব না।

কেন রে ?

এ তো এখন আমাদের এলেকা, আসতে দেব কেন তাদের ?

দেবদাস হাসিলেন ওঃ—।

বাঁয়ে নলখাগ্ড়ার বন প্রায় শেষ হইয়া আসিল বটে, কিন্তু ডাইনে হিজল বন শিমুল ও রয়না গাছের সংমিশ্রণে দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার পর আবার কি এক লতায় ডাইনের বনটাকে একেবারে ছাইয়া দিয়াছে,দশহাত দূরে বনের মধ্যে কি আছে জানিবার কোনই উপায় নাই।

জলাটার ধারে ধারে দুই একখানা ভাঙ্গা ইঁটের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে, এই বিজন অরণ্যে ইহা কোথা হইতে আসিল, সেও এক সমস্যার কথা। দেবদাস উহাই ভাবিতেছিলেন—এমন সময় বাঞ্ছা চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবু বন্দুক ধরুন, শিবু, বল্লম ঠিক ক'রে ধর্, ঐ যে এল !

দেবদাস একটা হিজল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বন্দুকটা শক্ত করিয়া ধরিয়া জলার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুদীর্ঘ হোগলা-বনের ভিতর হইতে একটা মহিষ-শিশু বাহির হইয়া আসিতেছে, পিছনে আর একটি, বোধ হয় তাহার মা। মানুষ দেখিবামাত্র ধাড়ী মহিষটা

কেমন করিয়া তাকাইল. মুহূর্তে তাহার চোখ দুটি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তারপর ক্রোধে সে এক ভীষণ গর্জন করিল, সঙ্গে সঙ্গে জলার বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ভৈরব কণ্ঠ তাহার আহ্বানে সাড়া দিল।

শিবু বলিল, বাবু শীগগির গাছে উঠুন, নইলে নিস্তার নেই।

দেবদাস তাহা বুঝিলেন, তিনি ডান হাতে একটা ডাল ধরিয়া এক লাফে হিজল গাছে উঠিয়া বসিলেন, শিবু ও পঞ্চু বিদ্যুদ্‌গতিতে আর একটা গাছে উঠিল। মহিষটা তখন হিজল-গাছের নীচে আসিয়া গিয়াছে। দেবদাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, হোগলা বন ভেদ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে আরও অনেক মহিষ। শিকার করিতে আসিয়া এমন অবিবেচনার কাজ তিনি আর একটিবারও করেন নাই।

প্রথম মহিষটা রাগে উন্মত্ত হইয়া শিং দিয়া হিজলগাছের গোড়ার মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। শিবু পাশের গাছ হইতে ডাকিয়া বলিল, বাবু. গুলি করুন, আমাদের বল্লম একবারের বেশি দু'বার কাজে লাগাতে পারবো না।

শিবুর বুদ্ধি আছে। সমস্ত বন কাঁপাইয়া দেবদাসের বন্দুক হুংকার দিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিষ আর্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু হোগলার বন কাঁপাইয়া চোখ লাল করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে আরও অনেক মহিষ. প্রায় পনের বিশটি। দেবদাসের বন্দুক গাদিয়া লইতে যে সময় লাগিল, তাহাতে হিজলগাছের গোড়ার অর্দ্ধেক মাটী শিঙের গুঁতায় প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। দেবদাসের বন্দুক আবার বন কাঁপাইয়া তুলিল, তাহাতে মহিষ মরিল একটি, কিন্তু বাকিগুলি ক্রোধে ভয়ংকর হইয়া উঠিল, তাহারা ভীম বিক্রমে হিজলগাছ ভূমিসাৎ করিতে লাগিয়া গেল। শিকার করিতে আসিয়া দেবদাসের এমন বিপত্তি আর কোন দিন হয় নাই। তিনি বুঝিলেন, বন্দুক আর একবার গাদিয়া

লইবার আগেই হিজলগাছ মাটীতে পড়িয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ মহিষগুলির সুতীক্ষ্ণ শিংগুলি তিনি যেন সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহিষগুলি শিবু ও পঞ্চুকে তখনও দেখিতে পায় নাই। মুনিবের প্রাণ রক্ষা করিতে শেষ মুহূর্তে কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়াই হউক, অথবা কাহারও জন্যই আত্মরক্ষার শেষ সম্বল ত্যাগ করিতে নাই, এই সুবিবেচনার জন্যই হউক, শিবু ও পঞ্চু তাহাদের বর্শা দুইটি তখনও নিক্ষেপ করে নাই।

সহসা পিছনের লতামণ্ডপ ভেদ করিয়া দু'খানি শক্ত গাছের ডাল আসিয়া পঞ্চু ও শিবুর ডান হাতের কব্জীতে সজোরে আঘাত করিল। এই আঘাতের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না, বর্শা দুইটি মাটীতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই লতার দেওয়াল ভেদ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন জোয়ান, মালকোচা দিয়া কাপড় পরা, হাতে ঢাল ও শড়কি—মুখে থাবা নিয়া এক অদ্ভুত ভয়ংকর শব্দ করিতে করিতে তীরের মত বাহির হইয়া আসিল।

মহিষগুলি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হইল, তারপর ভীম বিক্রমে এই নবাগত শত্রুদের আক্রমণ করিল। কিন্তু সে আক্রমণ একেবারেই নিষ্ফল, শিংএর সম্মুখে ঢাল রাখিয়া এক সঙ্গে পঞ্চাশটা শড়কি চলিল। মহিষাসুর ও মানুষের যুদ্ধে বনের মাটী কাঁপিয়া উঠিল।

সহসা লতামণ্ডপের ভিতর হইতে শিঙ্গাধ্বনি হইতে, কয়েকটি লোক গিয়া পঞ্চু ও শিবুকে বাঁধিয়া ফেলিল, চোখে তাহাদের গামছা বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে পাঁচ ছয়টা মহিষ শড়কির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইলে বাকি-গুলি বিকট শব্দ করিতে করিতে পলাইয়া গেল।

দেবদাসের চোখের উপর যেন ভোজবাজী হইতেছিল, এতক্ষণে

তিনি নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। বন্দুক গাদা সারা হয় নাই, হইলেও এত বড় দলের মাঝে, বিশেষত যাহারা তাহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে—তাহাদের উপর, বন্দুক ব্যবহার করা চলে না।

একজন বেঁটে জোয়ান দেবদাসের নিকট আগাইয়া গিয়া বলিল, এইবার ওডা ফ্যালাও।

দেবদাস বন্দুকটা ছাড়িয়া দিলেন। বেঁটে লোকটা বন্দুকটা কুড়াইয়া লইয়া একবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, এইডে নিয়ে এই বনে এতদূর আসতি সাহস করিছ তুমি?

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক একটা লোকের হাতে বন্দুকটা দিয়া সে বলিল, যা দোড়য়ে যা, বড় সর্দারের হাতে দিয়ে আয়।

লোকটা দৌড়াইয়া কোন দিকে যায় দেখিবার জন্য দেবদাস চোখ ফিরাইতেছিলেন, বেঁটে লোকটা ঢাল দিয়া আড়াল করিল। দেবদাস একটা লাফ দিয়া ঢাল ছাড়াইয়া দেখিয়া লইলেন, বন্দুক লইয়া লোকটা লতা-আস্তরণের ভিতরে ঢুকিতেছে।

দেবদাসের চারিদিকে তখন ঢাল-শড়কিওয়ালা লোকগুলি ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বলিষ্ঠ লোক হুকুম দিল, বাঁধ ওরে, হাত-পা বাঁধে' চোখ ঢা'কে দ্যাও।

বেঁটে লোকটা বলিল তুমি আস ছোট সর্দার, আমি পারব না।

মরদ না তুমি?

ছোট সর্দার একটা হুংকার ছাড়িয়া বলিল, এই সব, ওরে বাঁধতো।"

বেঁটে লোকটার না পারার কারণ তাহার কাপুরুষতা নয়, দেবদাসকে দেখিয়া কেন যেন তার মনে একটা দুর্বলতা আসিয়াছিল। ছোট সর্দারের শ্লেষে উত্তেজিত হইয়া বেঁটে লোকটা তাহার কোমরের গামছা খুলিয়া দেবদাসের চোখ বাঁধিতে যাইতেছিল, ছোট সর্দারের

ইঙ্গিতে আরও আট দশজন লোক ছুটিয়া আসিতেছিল, এমন সময় এক অসম্ভাবিত কাণ্ড ঘটিয়া গেল, দেবদাসের লাথি খাইয়া বেঁটে লোকটা গড়াইয়া পড়িল, চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে দেবদাস তার ঢাল ও বল্লম কুড়াইয়া লইয়া বন্দী পঙ্কু ও শিবুর প্রায় গায়ের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্তের জন্য এতগুলি জোয়ান লোক সব থ হইয়া গেল। এখনই কি কাণ্ড আরম্ভ হইবে দেবদাসের তাহা অজানা ছিল না, বল্লমের সুদৃঢ় বংশদণ্ডের মধ্যভাগ ধরিয়া লাঠি বানাইয়া বাঁ হাতে শিবু ও পঙ্কুর বাঁধন খুলিতে লাগিলেন। প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্তের গভীর নীরবতার মত এই ভীষণ লোকগুলি কিসের প্রতীক্ষায় যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। সহসা ছোট সর্দার গর্জন করিয়া উঠিল, চালা লাঠি, চালা শড়কি, ওডারে গাঁথে' নিয়ে চল বড় সর্দারের কাছে।

পঙ্কু ও শিবু তখন বন্ধনমুক্ত হইয়া বল্লম লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছোট সর্দার দেবদাসকে শড়কিতে গাঁথিবার হুকুম দিল বটে, কিন্তু কার্যত তাহাকে বিদ্ধ করা অত সহজ হইল না। দেবদাসের অঙ্গের চারিদিকে কঠিন বংশদণ্ড তখন বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতেছে। বিপক্ষ পক্ষ হইতে যতগুলি বর্শা নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার প্রত্যেকটি ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরই আঘাত করিতে লাগিল, যে ঢালে রুখিতে পারিল, সে বাঁচিল, যে না পারিল, তাহার অঙ্গ বিদ্ধ হইল। পঙ্কু এবং শিবুও আত্মরক্ষা করিতে প্রাণপণ লড়িল।

এতগুলি শক্তিশালী শত্রুর হাতে তাহাদের নিস্তার নাই, তাহা তাহারা জানিত। তবু লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহারা ক্রমে পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

এই বিজন বনের ভিতর ইহাকে মারিয়া ফেলিলে ইহার গলার হার, হাতের অঙ্গুরী ও তাগা ছাড়া আর কিছু লাভ হইবে না, কিন্তু বাঁচাইয়া

রাখিতে পারিলে কৌশলে বেশী কিছু লাভ হইতেও পারে—এই ভাবিয়াই ছোট সর্দার দেবদাসকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দেয় নাই।

দেবদাস একা এতগুলি লোকের সঙ্গে লড়িয়া দুবল হইয়া পড়িতে-ছিলেন, পঞ্চু ও শিবু আগেই আহত হইয়া পড়িয়াছিল। আর নিস্তার নাই জানিয়াও লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দেবদাস ক্রমে পিছাইয়া যাইতে-ছিলেন, তাহা ছাড়া আর কি করিবারই বা ছিল!

পিছাইতে পিছাইতে দেবদাস যখন আর একটা হিজলগাছের একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, ছোট সর্দার ও বেঁটে লোকটা একটা মোটা দড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া দেবদাসকে গাছের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল। দেবদাস এতক্ষণ লাঠি-চালনায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইবার পনের বিশজন লোক তাহার উপর পড়িয়া তাহার হাতের লাঠি কাড়িয়া লইল। দেবদাস বন্দী হইলেন। বেঁটে লোকটা আসিয়া গামছা দিয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া দিল। ডাকাতের দল হাতের থাবা মুখে দিয়া একটা ভয়ংকর শব্দের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিল।

সারাদিনের পরিশ্রম, যুদ্ধের উত্তেজনার পর একটা দারুণ অবসাদ, ভাগ্যের ক্রূর পরিহাস—সকলে মিলিয়া দেবদাসকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার উপর তাঁহার চোখ বাঁধা, কোন্ পথে তাহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে পঞ্চু ও শিবুরই বা কি হইল, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ যাইবার পর দেবদাস অর্ধচেতনার ভিতরেই বুঝিলেন, বাহকেরা ক্রমে যেন একটু উঁচুতে উঠিতেছে, মাটী যেন ক্রমে শক্ত, এমন কি স্থানে স্থানে কঠিন প্রস্তরময় বোধ হইতে লাগিল।

উঁচুতে একটা অপেক্ষাকৃত সমান জায়গায় গিয়া লোকগুলি এক সঙ্গে

চীৎকার করিয়া উঠিল, জয় কালী মাইকি জয়, জয় বড় সর্দার কি জয়, জয় যোগিনী মাইকি জয় !

হুংকার শুনিবামাত্র কে যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিল, বল—জয় কালী মাইকি জয় ! বামা কণ্ঠ—স্বরটা নিখাদে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ যেন রেখাবে নামিয়া গেল ! দেবদাস বিপন্ন অবস্থাতেও ভাবিলেন, ভৈরবীর কণ্ঠে মাধুর্য আছে,—কিন্তু উৎসাহটা থামিয়া গেল কেন ?

একটা গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠে কে যেন বলিল, মা তুই ঘরে যা, আজ তুই থাকতি পাবি নে অ্যাহানে।

মেয়েটি বোধ হয় এরূপ আজ্ঞা শুনিতে অভ্যস্ত নয়, প্রত্যুত্তরে বলিল, ক্যান্, আগে তো কোন দিন বারণ করো নি !

—আমি বুলতিছি, তুই ঘরে যা।

মেয়েটি দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষীণ পদশব্দে অভিমানের স্বর ধ্বনিত হইতেছে। দেবদাস এমন বিপন্ন অবস্থায়ও কান পাতিয়া তাহা অনুভব করিলেন। মেয়েটি নিশ্চয় বৃদ্ধের কন্যা।

দেবদাসের চোখের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি চারিদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলেন। তাঁহাকে যেখানে আনা হইয়াছে, তাহা একটি প্রকাণ্ড পাকাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এই বিজন অরণ্যের ভিতর পাকাবাড়ি কি করিয়া আসিল—ভাবিতে গিয়াই মনে হইল, হয় তো ইহা কোন নীলকর সাহেবের কুঠী—বা রাজা সীতারামের কোন কীর্তি। পঞ্চু এবং শিবুর চোখের বাঁধনও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা মিট্ মিট্ করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া বেঁটে লোকটা

তাহাদের চোখের উপর শড়কি লইয়া বলিল,—চোখ গা'লে দেব যদি অমন করে চা'বি।...শিকার করতি আইছেন!

যে বৃদ্ধ লোকটি সকলের উঁচুতে একটা পাকা বাঁধানো জায়গায় বসিয়া ছিল, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝা গেল, সে-ই মেয়েটিকে হুকুম করিতেছিল। এইবার লোকটি দেবদাসের দিকে চহিয়া আদেশ করিল, তারপর—নিয়ে আসো দেহি রাজপুত্তুরির এই দিক্, ও ছ্'ড়োরেও নিয়ে আসো।

দেবদাস, পঞ্চু ও শিবুকে বড় সর্দারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। বড় সর্দার দেবদাসের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, তারপর, রাজপুত্তুরের এ্যহানে আসা হইছে ক্যান্?

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বড় সর্দারের মুখ ভয়ংকর, বীভৎস হইয়া উঠিল। এতদিন লোকটা যে কত মানুষের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে, এক নিমেষে তাহার মুখের রেখাগুলি যেন স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিয়া গেল। বৃদ্ধের ব্যঙ্গোক্তিতে দেবদাস কোন উত্তর করিলেন না।

কি, কথা কও না যে নবাব-পুত্তুর,—ঐ শড়কি দেখতিছ—না? চোখ দুডো ঘা'ল করে দেব, সাড়াশী দিয়ে জিভে টানে' ছেঁড়ব।...এই, তোরা ওর গলার আর হাতের ওগুলো এহোনও রাহিছিস্ যে!

তিন চারিজন লোক আসিয়া দেবদাসের গলার হার, হাতের তাগা ও অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ আবার হুংকার দিয়া উঠিল, এ বনে ক্যান্ আইছো কও।

দেবদাস বৃদ্ধের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—শিকার ক'রতে।

শিকার কোরতে!—শিকার করতি আর জায়গা পাও নি,—জান না—কালু সর্দারের বনের থে' কেউ জ্যান্ত ফিরে যাতি পারে না!

ছোট সর্দার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বড় সর্দারের দিকে চাহিল। বৃদ্ধ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, তুই থাম হীরু, আমাগারে নাম জানলো তো ভয় কি?—ওডারে এ বনেথে আস্ত ফিরে যাতি দেব না কি আমি? —কালু সর্দারের চেনেন না,—ঘুঘু—ধান খাতি আইছেন!

ক্রোধে বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল: এ বনে ক্যান আইছো—কও।

এ বন আমার, এ বন কিনেছি আমি।

চারিদিক হইতে ডাকাতের দল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল, এ বন ক্যান্ কিনিছো, কন্‌কের জমিদার তুমি?

ইস্‌লামপুরের।

তা' হ'ক—এ বন ক্যান্ কিনিছো?

প্রজা বসাব, চাষ করাব।

চারিদিক হইতে আবার অট্টহাস্য উঠিল। বৃদ্ধ ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল, পেরজা বসাব,—আহ্লাদ! রাজা বাহাদুর সাহস করলো না,—উনি পেরজা বসাবেন। পেরজা বসালি আমরা যাবো ক'হানে শুনি! পেরজা বসাচ্ছি আমি—ছ্যাহো না।...এই হীরু, এডারে,... না আগে ওড়ু'ডোরে আঁধার কুঠরিতি নিয়ে যা,—আর এডারে মা কালীর ঘরে নিয়ে যা।"

নিকটস্থ একটি কুঠরি হইতে শান্ত কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল, বাবা!

ক্যান্ মা!

আজ না।

ক্যান্ মা?

আজ যে আমার জন্মদিন, ফাল্গুনী পূর্ণিমা আজ।

কথাটা শুনিয়া বৃদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল, কিন্তু যদি পালায়ে যায়, তার জন্যি দায়িক তুমি।

হাসির সঙ্গে জবাব আসিল, আচ্ছা।

অদৃশ্য নারীকণ্ঠের এই কথা ও হাসি দেবদাসকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করিয়া রাখিল। মনে হইতে লাগিল, চারিদিকের রূঢ় বাস্তবতার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে একটা স্বপ্নময় কল্পনাজগতের রহস্যময় স্বর যেন তাহার কানে ভাসিয়া আসিয়াছে।

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শিবু ও পঞ্চুকে আঁধার-কুঠরিতে লইয়া যাওয়া হইল, দেবদাসকে মা কালীর ঘরের পাশের ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হইল। ঘরে কুলুপ পড়িল।

*
* *

সন্ধ্যাকালে মায়ের প্রসাদ বলিয়া যে দুধ ও ফল দেবদাসের কাছে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল, মরণ শিয়রে করিয়া তাহা খাইবার মত ইচ্ছা দেবদাসের ছিল না। কিন্তু যে লোকটা প্রসাদ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানা গেল যে, মায়ের পূজার পুরোহিত স্বয়ং যোগিনী মা এবং প্রসাদও তিনিই পাঠাইয়াছেন, তখন সেই শব্দময়ী নারীর কথা স্মরণ করিয়া দেবদাস তাহা গ্রহণ করিলেন।

উপরের দুইটি গবাক্ষ দিয়া পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার দিকে চোখ পড়িতে দেবদাসের মন মুক্তির জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল, কিন্তু সে আশা বৃথা: ঐ সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে কেহ বাহিরে যাইতে পারে না, তাহা ছাড়া হস্ত-পদ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেবদাস কখন ঘুমাইয়া

পড়িলেন। ঘুমের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি ভোলেন নাই, আজিকার ঘুমই তাঁহার এ জীবনের শেষ ঘুম।

*
* *

ঘুমের মাঝে দেবদাসের একবার মনে হইল, তাঁহার হাতপায়ের লোহার শিকল ক্রমে খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। এমন দুর্ভাগ্যের জীবনে—ইহা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয় : দেবদাস আধো ঘুমের মাঝেই একবার হাসিলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন—হাতের শিকল খুলিতে খুলিতে কাহার অঙ্গুলির স্পর্শ যেন তাঁহার হাতে লাগিয়া গেল। যখন তাঁহার জীবন কাল শেষ হইতে চলিয়াছে, এমন করিয়া ঘুমঘোরে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার অর্থ কি! ঘুমের জড়তা ভাল করিয়া কাটে নাই, দেবদাস সদ্যোমুক্ত দক্ষিণ হস্তে শত্রুর হাত চাপিয়া ধরিলেন।

উঃ লাগে, ছাড়েন।

এক মুহূর্তে দেবদাসের ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার দৃঢ়-মুষ্টির মধ্যে যাহার হাত আবদ্ধ, সে কোন কঠিন-কায় যুদ্ধ-যোগ্য পুরুষ নয়, অতি কোমল স্বাস্থ্যবতী শক্তিশালিনী নারী। মেয়েটির হাত দেবদাসের হাতের ভিতর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, দেবদাসের জীবনেও এই প্রথম নারীর স্পর্শ. সুতরাং তাঁহারও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেবদাস নিজের জাগ্রত অবস্থাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। উপরের গবাক্ষ-পথে ঘরে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আলোতে দেখিলেন—মেয়েটি সুন্দরী, স্বাস্থ্যে, বর্ণে, গড়নে, রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। দেবদাস নারীকে চিরকাল উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চ-

বিংশতি বর্ষ বয়সে বিবাহের সম্বন্ধ অনেক আসিয়াছে, মায়ের শত অনুনয় তিনি অবহেলা করিয়াছেন, কিন্তু আজ এই বিজন অরণ্যে মরণ শিয়রে করিয়া তাঁহার মনে হইল—এমন কন্যা তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী হইলে—তিনি বিবাহ করিতে রাজি ছিলেন।

মেয়েটি ধরা পড়িয়া লজ্জায় মুখ নত করিয়াছিল। সে হয়তো মনে করিয়াছিল, বন্দীকে বন্ধন-মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারিলে প্রথম সুযোগেই সে পলাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু তাহা আর হইল না। দেবদাস অভিভূত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

মেয়েটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপে চুপে বলিল, আর এট্টুও দেরী করবেন না, আপনি প'লান।"

তুমি কে, তা' না বল্‌লে আমি কিছুতেই পালাব না, আর আমি বাঁচলে তোমার স্বার্থ কি?

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়া দেবদাসের মুষ্টিবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দেবদাস বুঝিলেন, নারী হইলেও ইহার গায়ে শক্তি অসাধারণ। দেবদাস বলিলেন, ছেড়ে দিতে পারি যদি নিজের পরিচয় দাও, নইলে সারারাত এমনি করে ধরে রাখব। আমি তো মরতেই চলেছি, তুমিও মারা পড়বে।

মেয়েটি হাসিয়া উঠিল, আমার গায়ে এ্যাহানে কেউ হাত দিতি পারবে না, এট্টা খড়্‌কের আঁচড়ও না।

কেন?

আমি কালু সর্দারের মেয়ে!

কালু সর্দারের মেয়ে!—দেবদাসের মুষ্টি অকস্মাৎ শিথিল হইয়া গেল।

কি, ভয় পা'লেন না কি?

না ভয় না,...তুমিই কি সর্দারের কাছ থেকে আজকার মত আমার জীবন ভিক্ষা করে নিয়েছিলে ?

কথাটা শুনিয়া মেয়েটি একটু লজ্জা পাইল, মুখ নীচু করিয়া সে বলিল, আমার জন্মদিনডা সকলেই এ্যাহানে মানে,—আমি শুধু সেডা মনে করায়ে দিছি।

দেবদাস বুঝিলেন, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, কথা বলিতে জানে। তাহাকে দেখিবামাত্র মনে যে ভাব জাগিয়াছিল, এখন কথা বলিয়া বলিয়া তাহাকে মঞ্জরিত করিয়া তোলা চলিত, কিন্তু তাহা না করিয়া দেবদাসের নিজের মনকে শাসন করিতে হইতেছে : সে যে কালু সর্দারের মেয়ে !

দেবদাসের বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তুমি সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, আর এই গভীর রাত্রে গোপনে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার বন্ধন মোচন ক'রতে এসেছ—এ কথার অর্থ আমি বুঝি,—কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিল, কত রকমেই তুমি আমায় ঋণী ক'রে রাখলে, এ জীবনে তা' শোধ দেবার সুযোগ হয় তো আমি পাব না।

মেয়েটি দেবদাসের দিক্ হইতে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া কি যেন চাপিল, তারপর বলিল, শোধ দিয়ে আর কাজ নেই, আপনি এখনই পলান দেখি, দেরী করলি দুই জনেরই বিপদ হ'বে'নে।

দূরে খট্ করিয়া কিসের যেন একটা শব্দ হইল, মেয়েটি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল : বা'র হন,—আর এট্টুও দেরী করবেন না। —মেয়েটির দৃষ্টি ভয়-চকিত হইয়া উঠিল।

দেবদাস দাঁড়াইয়া দরজার সম্মুখে মেয়েটির পথরোধ করিয়া বলিলেন,—তোমার নাম...তোমার নামটি বলে যাও আমায়।

মেয়েটি উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছিল, চোখে সেই ভয়-চকিত

দৃষ্টি,—বলিল, নাম ?—আমার নাম কাঞ্চন। কিন্তু আপনি এ্যাহনই দোড়োয়ে পলান, আমারে যাতি দেন, ওদিকে শব্দ হইছে।

দেবদাস দু'হাত বাড়াইয়া পথরোধ করিয়া বলিলেন, একটু দাঁড়াও তুমি,—আমার তো যাওয়া হয় না। কাঞ্চন,...শিবু ও পঞ্চু আমার লোক-দু'টি বাঁধা পড়ে রয়েছে,—তাদের আমিই সঙ্গে করে এনেছি। তাদের না নিয়ে আমি কি করে যাই! আর আমায় ছেড়ে দিলে ওরা যখন বুঝতে পারবে, তখন কি ওরা তোমায় ক্ষমা করবে?

কাঞ্চনের বুক ঠেলিয়া কি যেন উঠিতে চায়: হয় তো সে ভাবিল—মানুষের মন এত বড় হয়!—হয় তো বা তার মনে হইল—এ সে কি করিতেছে—একজন অপরিচিতকে বাঁচাইতে গিয়া সে কতজনের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে,—এ তাহার কি হইল!

আবার শব্দ হইল। শুনিয়া কাঞ্চনের সংজ্ঞা ফিরিল, সে তাড়াতাড়ি দেবদাসের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, শীগগির সরেন,—পথ ছাড়েন—

কিন্তু পথ আর তাহাকে ছাড়িতে হইল না,—মা-কালীর ঘরসংলগ্ন সেই ঘরের সম্মুখে—'পিটেপোড়া'-গাছতলায় চার-পাঁচজন লোক শড়কি হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকাইয়া তাহারা হুংকার দিয়া উঠিল,—কেডা ও,—ঘরে দাঁড়ায়ে কেডা?

দেবদাস কোন উত্তর দিলেন না, জ্যোৎস্নালোকে কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার মুখের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত একটি হাসির রেখা খেলিয়া গেল। বিনা বাধায় তিনি পুনরায় বন্দী হইলেন। কাঞ্চন ধীরে ধীরে একপাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল, লোকগুলি তাহাকে দেখিয়া মাথা নীচু করিল। শুধু একজনের মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইয়া গেল—যোগিনী মা!

*
* *

রাত্রি প্রভাত হইলেই দেবদাস ভয়ংকর একটা কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর আবদ্ধ থাকিয়াই তিনি বুঝিতে ছিলেন—বাহিরে এবার পাহারা নিযুক্ত হইয়াছে। নিজের জন্য মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর কোন শাস্তি তিনি কল্পনা করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু এই সুন্দরী অপরিচিতা মেয়েটি তাঁহার জন্য কি কলঙ্ক বরণ করিয়া লইল! দেবদাস নিজের জন্য এবার মায়া বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঁচিবার কোন উপায়ই আর রহিল না।

সারাদিন লোকের গতিবিধির শব্দ শুনিয়া তিনি বুঝিতে লাগিলেন, বাহিরে কিসের একটা আয়োজন চলিতেছে, এখনই হয় তো তাহাকে পুনর্বিচারের জন্য কালু সর্দারের সম্মুখে অথবা বলি দিবার জন্য মায়ের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইবে। দেবদাস বুঝিতে পারিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহার একবার কাঞ্চনকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, অথচ তাঁহাকে কেহ লইতে আসিল না,—দেবদাসের কেমন আশ্চয বোধ হইতে লাগিল। প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় ঘর খুলিবার শব্দ শোনা গেল। একটা লোক আসিয়া একবাটী দুধ-কলা ও আখের গুড় রাখিয়া গেল। ঘরে আবার কুলুপ পড়িল। আবার সেই ভয়ংকর মুহূর্তের ধ্যানে কাল কাটিতে লাগিল।

*
* *

নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেবদাস কেমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ—'জয় কালী মাইকি জয়, জয় যোগিনী মাইকি জয়'—শব্দে তাঁহার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আর দেরী নাই

বুঝিয়া দেবদাসের বীর-হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। দেবদাস একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন: সারাদিন ধরিয়া কালু সর্দার যে মতলব আঁটিয়াছে, তাহাতে নিতান্ত সহজ-মৃত্যু তাঁহার হইবে না,—কিন্তু কাঞ্চনকেও তো ইহারা শাস্তি দিতে পারে—ভাবিতেই এই করুণাময়ী—সুন্দরী কন্যার উপর সহানুভূতিতে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল।

এমন করিয়া বাঁচিবার সাধ দেবদাসের আর কোন দিন হয় নাই।

কিছুক্ষণ পর কয়েকটি লোক আসিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবদাসকে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে।

মা-কালীর ঘরের সম্মুখে যখন তাঁহাকে নামানো হইল, তখন সেখানে লোকে ভরিয়া গিয়াছে, সকলের হাতেই লাঠি ও ঢাল, মুখে উৎসবের উল্লাস। মানুষের প্রাণ লইতে যাহাদের এত আনন্দ, তাহারা কোন্ স্তরের জীব!—দেবদাসের অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া গেল।

মায়ের ঘরের সিঁড়িতে বসিয়া বুড়ো সর্দার কালু ও তাহার বামে কাঞ্চন। দেবদাসকে সেখানে আনা হইলেই লোকগুলি আর একবার জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। দেবদাস দেখিলেন, কাঞ্চন একখানা পাটকেলী রংয়ের বেনারসী পরিয়াছে। ডাকাতের মেয়ের বেনারসী পরিতে অভাব হয় না সে কথা তিনি জানেন, কিন্তু কাল রাত্রে যে মেয়ে রক্তবসন পরিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিল, আজ তাঁহারই মৃত্যু উপলক্ষে সেই মেয়ে উৎসব-বেশে সাজিয়া আসিয়াছে দেখিয়া দেবদাসের সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া উঠিল: এ জগতে বাঁচিয়া থাকিবার মত কোন আকর্ষণ তাহা হইলে থাকিতে পারে না। জগতের প্রতি বিতৃষ্ণায় জীবন ভরিয়া মৃত্যুকে সহজ করিয়া লইবেন বলিয়া দেবদাস আর একবার কাঞ্চনের দিকে তাকাইলেন: সুন্দর দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি

থাকা সত্ত্বেও কা'ল রাত্রের মত ঔজ্জ্বল্য যেন মুখে নাই, কি একটা নিদারুণ দুঃখ যেন সে অতি কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছে, কালু সর্দারের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

তৎক্ষণাৎ ঢোল ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল, দেবদাস দেখিলেন, শিবু ও পঞ্চুকেও এক পাশে আনিয়া নামান হইয়াছে।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দশজন বাছাই-করা জোয়ান্ লাঠি লইয়া পাঁয়তাড়া করিতে করিতে মা-কালীর ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল: "জয় কালী মাইকি জয়, জয় যোগিনী মাইকি জয়।"

তারপর বাদ্যের তালে তালে তাহারা নানারূপ খেলা-কসরৎ দেখাইতে লাগিল। প্রথমে শুধু লাঠির খেলা, তারপর লাঠি ও শড়কি লইয়া খেলা, পরে অনেক লোকে আক্রমণ করিলে লাঠি ঘুরাইয়া কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহার প্রদর্শনী। লোকগুলি খেলার নেশায় যেন মাতিয়া উঠিল: একটা লোককে হত্যা করার মত ভয়ংকর কাজও যেন তাহাদিগকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

ইহার পর আরম্ভ হইল লাঠির শক্তিপরীক্ষা। দুই দুই জন করিয়া জোড় মিলাইয়া শক্তি-পরীক্ষা হইল। বিজয়ীদের ভিতর আবার জোড় মিলাইয়া শক্তি-পরীক্ষা হইল। দশজনের ভিতর যে সকলকে পরাস্ত করিল, সে গিয়া কাঞ্চনকে প্রণাম করিল। চারিদিক হইতে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, জয় যোগিনীমায়ের জয়।

কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর মা-কালীর উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম জানাইয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া কালুসর্দারের পায়ের নিকট হইতে একটা তেলে পাকানো লাঠি তুলিয়া লইল। মুখে তাহার একটুও উত্তেজনা নাই।

দেবদাস ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন: একটা মানুষ মারিতে তাহাদের এত আয়োজন করিতে হয় কেন—অথবা ইহা কি উহাদের অন্য কোন উৎসব ?

আবার মহা-উদ্যমে ঢোল ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল, আর সেই বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া কাঞ্চন সেই বিজয়ীখেলোয়াড়ের সঙ্গে লাঠি খেলিতে লাগিল। দেবদাস দেখিলেন, পা ফেলার ভঙ্গীতে, আঘাতের কৌশলে এবং দৃষ্টির প্রখরতায় কাঞ্চন লাঠিয়ালের মাথার মণি: জীবন সহজ হইলে, জাতি অভিন্ন হইলে, এ মণি দেবদাস গলায় পরিতেন।

ইহার পর শক্তি-পরীক্ষার খেলা! এ খেলা আর বেশীক্ষণ খেলিতে হইল না, দুই একটা প্যাঁচ্ খেলিবার পরই কাঞ্চনের লাঠির আঘাতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর লাঠি হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। কালুসর্দারের মুখ হইতে বাহির হইল, সাবাস্ বেটী!

চারিদিক হইতে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, জয় যোগিনীমায়ের জয়, জয় যোগিনীমায়ের জয়!

পরাজিত বীর কাঞ্চনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

তারপর আরম্ভ হইল প্রণামের পালা। কালু সর্দার ব্যতীত আর সকলেই একে একে আসিয়া কাঞ্চনকে প্রণাম করিয়া গেল, কাঞ্চন সকলের মাথায় হাত দিয়া প্রশান্তমুখে আশীর্বাদ করিল।

* * *

সেদিন সন্ধ্যারতি শেষ হইলে মায়ের ঘরে দেবদাসকে লইয়া যাওয়া হইল। ঘরে তখন কালু সর্দার ও কাঞ্চন ছাড়া আর কেহই ছিল না। দেওয়ালে একখান খরধার খড়্গ ঝুলিতেছিল। কাঞ্চন পূজা সারিয়া সর্দারের এক পাশে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া ছিল। দেবদাস তাকাইয়া দেখিলেন, কাঞ্চনের চোখমুখ ফুলিয়া গিয়াছে: হয় তো একটু আগে

সে কাঁদিয়াছে, দেবদাসের মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া হয় তো সে বেদনা পাইয়াছে। যতই তাহাকে দেখিতেছেন ততই তাহাকে রহস্যময়ী বলিয়া মনে হইতেছে।

দেবদাসকে ঘরে আনা হইলেই কালু সর্দার কাঞ্চনকে বলিলেন, মা, তুমি এহোন এ্যাহান্‌তে' যাও, আমাগারে কথা আছে।

দেবদাসের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—বলির সঙ্গে কথা থাকা—আশার কথা।

কাঞ্চন চলিয়া গেলে কালু দেবদাসের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, তোমাগারে কার কি শাস্তি পাতি হবি—সে বিচের আমাগারে হয়ে গেছে—তা বোধ হয় জানো ?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ।

—জানো—তবু আর একবার ভাল করে জা'নে নাও : তোমার ও দু'ডো লোকেরে আমরা দলে মিশেয়ে নেব,—কেমন করে' তা নিতি হয় তা আমরা জানি। আর তোমার ?—তোমার মায়ের এ্যাহানে বলি যা'তি হবি।"

কথাটা শুনিয়া বীর দেবদাসেরও মুখখানা আবার নূতন করিয়া শুকাইয়া উঠিল, কালু সর্দার তাহার ভয়াবহ মুখখানা হাসিয়া বিকট করিয়া বলিল, কিন্তু আমি তোমারে বাঁচায়ে দিতি পারি।

দেবদাস জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

কালু সর্দার বলিল, কি বাঁচতি চাও তুমি ?

—বাঁচতে আর কে না চায় ?

কালু সর্দার সুদীর্ঘ পাকা গোঁফটা একটু নাড়িয়া বলিল, হুঁ, কিন্তু কিন্তু তোমার বাঁচার দুডো পেস্তাব আছে,—তার এট্টা হচ্ছে—তুমি কাঞ্চনেরে বিয়ে করবা—

দেবদাসের মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল, কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ!

বুড়ো কালু সর্দার হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল; সে হাসি যেমন উৎকট, তেমনই ভয়ংকর। হাসির শব্দে ঘরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। হাসি একটু থামিলে কালু সর্দার বলিল, তুমি আমারে এমনি বোকা পাইছ, ঠাকুর, এঁ্যা! গলায় তোমার পইতে রইচে—সে কি আমি দেহি নি, অত বোকা হলি কি আর ডাকাতি করে মাথার চুল পাকাতি পারতাম? তুমি বামুন—আমি নমঃশূদ্দুর, আমার মেয়েরে কি তোমার বিয়ে করতি বুলতি পারি—অত অধম্ম করব আমি? ডাকাতি করি বটে, কিন্তু অধম্ম করি নে, বুঝলে ঠাকুর—অধম্ম করলি কি আর এতদিন ধরা না পড়তাম? তুমি কাঞ্চনকে বিয়ে করতি পার, কাঞ্চন বামুনের মেয়ে।

কাঞ্চন বামুনের মেয়ে!—উত্তেজনায় দেবদাস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় উঠিয়া বসিল। এত বড় শুভ সংবাদ বুঝি সে আর জীবনে শোনে নাই:

কাঞ্চন নিজে এ কথা জানে?

কালুসর্দার বলিল, আগে জানত না—কিন্তু ওর যহন বার বছর বয়স হ'ল, তহন আমি নিজেই জানায়ে দিছি। সেই থেহে ও নিজিই পাক করে খায়, গেরুয়া পরে। আমি নিজি হাতে ওরে লাঠি খেলা শড়কি চালান শিহেইছি।—এই এতো তো আমার চেলাবেলা দেখতিছো, এক হীরু ছাড়া কেউ ওর লাঠির কাছে দাঁড়াতি পারে না, তুমি নিজি একবার পরখ করে দেখতি পার—বলিয়া কালু সর্দার নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিল।

দেবদাসের মনটা যেন একটু স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিতেছিল।

শুধু এই গুণপনায় পাছে দেবদাসের মন না গলে, তাই সে প্রাণপণে বলিয়া চলিল, আর মা আমার রঁাধে বাড়ে কি—ঠিক যেন অমেত্ত—একবার খালি তুমি আর ভুলতি পারবা না—হাজার হ'ক বড় ঘরের মেয়ে কি না!

—কোথাকার মেয়ে?—দেবদাস সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল।

কথাটা শুনিয়া কালুসর্দারের মুখের ভাব মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। দেবদাসের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল, সব খুলেই তোমার বুলতিছি, তুমিও সব দিক হিসেব করেই কাজ কর, জান্ দেবা বা রাখবা?—মেয়ে ও বাড়িজ্জে ঘরের,—ক'নকের? —তা' এ্যাহন তোমার বুল্লি আর দোষ কি—নিশ্চিন্দিপুরীর বাড়িজ্জে —ওগারে দরজায় হাতী বাঁধা থাকত। ওর বাবা আমাগারে দলের সাথে যুদ্ধু করে মারা যায়, কাঞ্চন তহন আতুড়-ঘরে, মা ভয়ে আর শোকে মুচ্ছা যায়, সে মুচ্ছা আর ভাঙ্গে না।—কাঞ্চনকে তাই কুড়োয়ে নিয়ে আইছি—আর নিজে তাই ওর মা-বাবা হইছি—হাজার হ'ক ধম্ম আছে তো!

কালুসর্দারের নৃশংসতার কথা শুনিয়া দেবদাস শিহরিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের প্রতি তাঁহার চিত্ত মমতায় ভরিয়া গেল।

কালুসর্দার বলিয়া চলিল, "এ্যাহনে মেয়েমানুষ নিয়ে কেউ থাকতি পারে না, তাই লুকোয়ে ওরে আমার পরিবারের কাছে নিয়ে গেলাম, আমার পরিবার তখন বাঁচে ছিল, সে তো ওরে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পা'লো,—কিন্তু লোকে টের পা'য়ে যাতি পারে, তাই তারে কাঁদায়ে ওরে বনে আ'নেই মানুষ করিছি।

কালুসর্দার একটু থামিয়া বলিল, মানুষ ও এ্যাহানেই হইছে বটে, পুরুষির মাঝে—কিন্তু কু-নজর ওরে কেউ দিতি পারে না—একজন

দিছল, তার শাস্তি পাইছে সে। কালুসর্দার দেওয়ালে লম্বিত খড়্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, মায়ের ঐ খাঁড়া থাকতি সে সাহস আর কেউ পাবি নে। বলিয়া নিজের কৃতিত্বে নিজেই একটু হাসিল।

—এ্যাহানে ওরে সকলেই মা বুলে ডাকে, ভালবাসে, ছেদ্ধা করে। দলডা আমি ওরেই দিয়ে যাব।

দেবদাস এখন কাঞ্চনের কথাই ভাবিতেছিলেন। তার দুর্ভাগ্যের কথা যতই ভাবেন, ততই দেবদাসের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে: এমন সুন্দরী পুত্র-বধূ পাইলে মা কত খুশী হইবেন, বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়, প্রজারা কত খুশী হইবে। ভগবান্ যাহাকে আশীর্বাদ করেন, তাহাকে এমনি করিয়াই করেন। নিজের মুক্তির বিনিময়ে তাঁহাকে যাহা দিতে হইবে, তাহা তাঁহার পরম কাম্য ;—এর চেয়ে বড় আনন্দের কথা বুঝি তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

দেবদাস মনে মনে অনেক সুখের সৌধ গাঁথিয়া তুলিতেছিলেন, কিন্তু কালুসর্দারের পরের কথায় তিনি বুঝিলেন—সৌধ গাঁথা হইয়াছে বালুর উপর।

কালুসর্দার বলিল, এ্যাহন বোধ হয় বুঝতি পারিছো—কাঞ্চনকে বিয়ে করলি তোমার জাত যাবি নে ?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ।

—কিন্তু আমার দ্বিতীয় পেস্তাব আছে, সেডাও শুনে নাও··· সেডা হচ্ছে—কাঞ্চনকে বিয়ে করে' আমার দেওয়া টাকা-পয়সা নিয়ে তুমি এ বনেথে যাতি পারবা না।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া দেবদাস বলিলেন, মানে !

ভ্রূ কুঁচকাইয়া কালুসর্দার বলিল, মানে ! তুমি কি কচি ছাওয়াল

নাকি, মানে বুঝলে না, তোমারে এ বনেরথে' ছা'ড়ে দিলি আমরা বাঁচি না কি ?

কথাটা শুনিয়া দেবদাস পাথর হইয়া গেল।

—কি, কথা কও না যে ?

দেবদাস বলিলেন, এ কথা আমি ভেবে দেখি নি। এখানে থাকা মানে তোমাদের কাজে যোগদান করা—সে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পেলেও পারব না। আর—

আর দিয়ে কাজ নেই—কালুসর্দার দুই চোখ পাকাইয়া বলিল, তুমি বড় চালাক ছাওয়াল—আমারে বাগে পাইছো—না? মরণ বাঁচায়ে তোমারে মেয়ে দিতি চাইছি—তাই ভাবিছ কিই না জানি হইছ !—তুমি ভাবিছ মেয়েরে আমি বাগে আনতি পারব না—এত লোকের শাসন করি আমি—মেয়েরে আমি শাসন করতি পারব না—হা, হা হা—কাল রাত্তিরি মেয়ে তোমার কাছে গিছলো কিনা—তাই তোমার বল বা'ড়ে গেছে—ছ্যাহো না কি করি আমি, আজ মেয়ের নমস্কারের দিন ছিল, তাই আজকের দিনডা ভিক্ষে দিলাম—কাল রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মত চাই—আজকের রাতটা ভাবতি দিলাম। ...স্বীকার না করিলি যে হ্যাশে যায়ে রাজত্বি করতি পাবা—বা মার মুখ দেখতি পাবা—সেডা হবি নে—কাল রাত্তিরেই মার এ্যাহানে মাথা রাখতি হবি, তার চেয়ে বরং...যাক সে আর কি কবো—তুমিই ভাবে' ছ্যাহো।

দেবদাস অতি স্থির কণ্ঠে বলিলেন, এতে আর আমার ভাববার কিছু নেই।

—তবু আজকের রাত ভাবতি দিলাম তোমার।—বলিয়া দেবদাসের উপর হইতে দৃষ্টি অন্য দিকে সরাইয়া কালুসর্দ্দার হাঁকিল, হীরে—হীরেলাল !

ছোট সর্দার আসিয়া দাঁড়াইল।

—এডারে এ্যাহানথে' নিয়ে যাও, আমার যা বলবার তা আমি বুলিছি,—কাল সকালে শুধু ওর মতটা আনে' দেবা। যাও, নিয়ে যাও।

ছোট সর্দার আর দুই জন লোকের সাহায্যে দেবদাসকে সেখান হইতে লইয়া গেল।

*

* *

কাঞ্চন পাশেই কোথায় লুকাইয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। উহারা চলিয়া গেলে আসিয়া কালুসর্দারের কোলে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

কালুসর্দার কাঞ্চনের পিঠে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া বলিতে লাগিল, ছি মা, অমন করতি নেই, তোর কাঁদা কি কোন দিন দেহিছি নেকি আমি,—দেহি কাল সকালে কি বোলে ও,—তুই কাঁদিস নে, তোর জন্যি ওর চেয়েও ভাল রাজপুত্তুর ধরে আনে' দেব আমি—

কিন্তু কাঞ্চনের বুঝি সে কথা কানেও ঢুকিল না।

*

* *

পরদিন সন্ধ্যাকালে গড়ের মাঠে মা-কালীর ঘরের সমুখে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে ঃ সেই বামুন জমিদারকে বলি দেওয়া হইবে।

দেবদাস এ বনে থাকিয়া ডাকাতি করিতে স্বীকার করে নাই, তার চেয়ে মৃত্যুও না কি ভাল!

ডাকাতেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, লোকটা কি গোঁয়ার রে,—মরবি, তউ জিদ্ ছাড়বি নে। কি লাভডা হ'ল শুনি? ফিরে যাতি পারল দেশে—মার কোলে?

ছোট সর্দার বড় সর্দার মায়ের ঘরের সমুখের রোয়াকে বসিয়া রহিয়াছে। ঘরটার সুমুখ জবাফুল ও পাতা দিয়া সাজানো হইয়াছে।

কাঞ্চন স্নান করিয়া একখানা লাল বেনারসী পরিয়া পূজায় বসিয়াছে। বন্দী দেবদাসকে পাশে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তার চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একবার মায়ের মূর্তি, একবার কাঞ্চন, একবার বাহিরের জনতার দিকে তাকাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই হেঁট হইয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা লুকাইতেছেন।

সহসা কাঞ্চনের ইঙ্গিতে পূজাসাঙ্গের বাজনা আরম্ভ হইল। বাহিরের জনতা নরবলি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বেঁটে লোকটা খড়্গ হাতে করিয়া প্রস্তুত হইলে, ছোট সর্দারের আদেশে চারজন লোক বলি ধরিবার জন্য আগাইয়া গেল। অধীর জনতা আরও উন্মুখ হইয়া উঠিল।

কাঞ্চন হাতের ইঙ্গিতে দেবদাসের বন্ধন মোচন করিতে বলিল। দেবদাসের হাত-পায়ের বাঁধন খোলা হইল।

কাঞ্চন ইঙ্গিতেই লোকগুলিকে একটু সরিয়া যাইতে বলিল, লোক-গুলি সরিয়া দাঁড়াইল।

কাঞ্চনের চোখ দু'টি অদ্ভুত দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছে, লোকগুলি তাহা দেখিয়া মনে মনে তাঁহার পায়ে মাথা নত করিল: যোগিনী মায়ের ভক্তির তুলনা নাই।

কাঞ্চন সেই অদ্ভুত দীপ্তিময় চোখে দেবদাসের দিকে চাহিয়া বলিল, এইবার তুমি মাকে প্রণাম করো।

দেবদাস মন্ত্রমুগ্ধের মত কাঞ্চনের আদেশ পালন করিল। কাঞ্চন

একটা জবাফুলের মালা হাতে লইয়া দেবদাসকে আদেশ করিল, এইবার উঠে হাঁটু গাড়ে’ বসো।

দেবদাস জানু পাতিয়া বসিল।

এইবার কাঞ্চন জবাফুলের মালাটা দেবদাসের গলায় পরাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের গলাটা আগাইয়া দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ওটা আমার গলায় পরায়ে দাও।

কাঞ্চনের চোখের দিকে চাহিয়া দেবদাস কি দেখিল কে জানে, অথবা তাহার কণ্ঠের আদেশেই কি মোহ ছিল,—দেবদাস যন্ত্র-চালিতের মত মালাটা কাঞ্চনের গলায় পরাইয়া দিল।

উপস্থিত সমস্ত লোক এই আকস্মিক ঘটনায় প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর নিকটে ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিতে লাগিল, কি হ’ল, কি হ’ল—সর্ব্বনাশ!

কাঞ্চন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরকণ্ঠে দেবদাসকে বলিল, এইবার আবার মাকে প্রণাম করো।

দেবদাস মাকে প্রণাম করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনও মায়ের পায়ে মাথা নত করিল।

কালুসর্দার প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

প্রণাম শেষ করিয়া কাঞ্চন দেবদাসের হাত ধরিয়া কালুসর্দারের নিকটে আসিয়া হাসিয়া বলিল, এইবার বলি দিতি পারো, বাবা; আগে আমারে দিতি হবি।

শুধু একবার মাথা নাড়িয়া কালুসর্দার বলিল, ‘হুঁ’।

... ...

পরদিন সকাল বেলা।

কালুসর্দার গুম্ হইয়া বসিয়াছিল। কাঞ্চন যাইবার জন্য প্রস্তুত

দেবদাসকে সঙ্গে লইয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগিনী মা, তাহার ভাগ্যে যেন কি হয়—এই ভাবিয়া তাহার ভক্তদের মনও ভালো ছিল না ; তাহারাও তাদের মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাঞ্চন আসিয়া কালুসর্দারের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল : বাপের স্নেহ সে কালুসর্দারের নিকটেই পাইয়াছে।

কালু একটুও বিচলিত হইল না ; কাঞ্চনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল, তোরা এ্যাহোনই যাতি চা'স না কি ?

কাঞ্চন কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, তোমারে কত দুঃখই না দিলাম, বাবা !

কালু তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া ডাকিল, হীরু, হীরেলাল !

হীরু,—আর সবারে ডাকো।

হীরু ইসারায় দলের প্রধান প্রধান সকলকেই কালুসর্দারের কাছে আসিতে বলিল। তাহার গম্ভীর মূর্তির দিকে তাকাইয়া কেহই বুঝিতে পারিল না,—সে কি কথা আজ বলিতে চায় !

সকলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সর্দার গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল, তোমরা সকলেই এ্যাহানে আছো ?—

সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

তোমরা সকলেই এ্যাহানে আছো,—আর এতদিন তোমরা আমারে সর্দার বুলে মান্যি করে আইছো—

সকলে হাত জোড় করিল।

কোনও দিন আমার কথা অমান্যি করো নি।

হীরু সর্দার হাত জোড় রাখিয়াই বলিল, তোমার কথা কেউ কোন দিন অমান্যি করবি নে।

তা' আমি জানি। আর জানি বুলেই তোমাগারে কাছে আমি আজ দু'ডো পেস্তাব করতিছি—

সর্দারকে এমন করিয়া কথা বলিতে কেহ কোনদিন শোনে নাই ; সকলের বুকই কাঁপিয়া উঠিল।

তার এটটা পেস্তাব হচ্ছে—তোমরা আমারে বিদেয় দাও।

চারিদিক হইতে অমনি রব উঠিল, না, না, সর্দার তোমারে আমরা কিছুতি ছাড়তি পারবো না।

কালুসর্দারের কঠিন গণ্ড বাহিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ধীরকণ্ঠে সে বলিল, আমার আরেকটা পেস্তাব হচ্ছে,—তোমরা এ বন ছা'ড়ে চলে যাও,—যার যার গাঁয়ে যা'য়ে—মা বাপের কাছে থা'কে চাষবাস করে' খাও,—এডা আমার হুকুম,—এ বনে থাকলি তোমাগারে সকলেরই ধরা পড়তি হ'বি।

হীরু বলিল, কিন্তু তুমি ক'নে যাবা, সদ্দার, তোমার তো কেউ নেই ?

কালু কাঞ্চনের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি আমার জামাই বাড়ীই যাবো—ঠিক করিছি।

কাঞ্চন এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল, এবার ছুটিয়া আসিয়া কালুসর্দারকে জড়াইয়া ধরিল, তুমি সত্যি যাবা ?

কালু হাসিয়া উঠিল, সে হাসি যেমনি উৎকট তেমনি ভীষণ :

তুই মনে করিছিস্—তুই চলে গেলিও—আমি এই বনে থা'কে ডাকাতি করে বেড়াবো ?······সে কার জন্যি ? কার জন্যি—শুনি ?··· তুই চারডে খাতি দিস্, খাবো—নয় হাজতে পচবো,···ডাকাতি করবো আর কার জন্যি ?

কাঞ্চনের দুই গণ্ড বাহিয়া বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেবদাস আবেগে কালুসর্দারকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, হাজতে তোমার পচতে হবে না, সর্দার, তুমি যদি সত্যি আমার ওখানে যাও, শ্বশুরের সম্মানেই তুমি সেখানে থাকতে পাবে। একটা খড়কের আঁচড়ও তোমার গয়ে লাগবে না। আর—

দেবদাস একটু ইতস্তত করিয়া পরক্ষণেই বলিল, আমাকে যদি জামাই ব'লেই গ্রহণ করলে, তা' হ'লে আমিও তোমার কাছে একটি জিনিস চেয়ে নেব—এটা আমার যৌতুক,—বলো—তুমি দেবে ?

কালুসর্দার আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল: "তোমারে আমি আবার কি দিতি পারি, ঠাকুর ?

দেবদাস বলিল, কথা আমার রাখবে—বলো,—তা হ'লে বলব।

আচ্ছা, রাখবো।

দেবদাস বলিল, তোমার দলের লোকদের কাউকে এ বন ছেড়ে আর কোথায়ও যেতে বলো না। এ বন আমার, এ বন আমি ওদেরই দিয়ে যাচ্ছি। শুধু আমার অনুরোধ, ওরা ডাকাতি ছেড়ে দিক্। ওরা স্ত্রী পুত্র নিয়ে এসে এখানে বসবাস করুক, চাষবাস করুক। বিশ বছরের মাঝে যে যতটা জমি পরিষ্কার করে আবাদ করে নিতে পারে, সে জমি তার।

কালুসর্দার এইবার দেবদাসের চরণ ধূলি লইতে গেল: ঠাকুর তুমি দেবতা, এত বড় বুকের পাটা তোমার !

দেবদাস পিছাইয়া গেল: কর কি, কর কি সর্দার, তুমি যে আমার শ্বশুর।

আনন্দে কাঞ্চনের দু চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল: চারিদিক হইতে জনতা একসঙ্গে বার বার বলিয়া উঠিতে লাগিল:"জয়—যোগিনী মায়ের জয় ! জয় যোগিনী মায়ের জয় ! জয়...!"

*
*　*

শোনা যায়—যোগিনীমা রাজরাণী হইয়াও তার সন্তানদের কথা ভোলেন নাই। সুযোগ পাইলেই তিনি পাল্কী চড়িয়া তার সন্তানদের দেখিতে আসিতেন; তাহাদের ঘরে বসিয়া তাহাদের পরিবারের সুখ দুঃখের কথা শুনিতেন।

যোগিনীমা এখন আর নাই,—কিন্তু তাঁহার কীর্তি মাঠের বুকে অক্ষয় হইয়া আছে। এখনও ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে মাঠের এক অংশে বিরাট এক মেলা বসে। বিভিন্ন দিক হইতে যোগিনী মায়ের ভক্তগণ এখানে সম্মিলিত হইয়া লাঠি খেলায় শড়্‌কী চালনায় তাহাদের শৌর্য্যের পরিচয় দিতে দিতে—সমস্ত মাঠ কাঁপাইয়া দিন ভরিয়া কতবার এক সঙ্গে বলিয়া ওঠে—জয় যোগিনী মায়ের জয়!—জয় যোগিনী মায়ের জয়—জয় যোগিনী মায়ের জয়!

জাগুলি ধানের ক্ষেত

রাত্রি ভোর না-হইতেই নিবারণ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। বিছানায় শুইয়া থাকিলেও সারা রাত তার ভাল ঘুম হয় নাই। খোলা জানালা-পথে শেষ রাত্রের যে আবছা আলো আসিয়া পড়িয়াছিল তাহাতে দেখা গেল—আমকাঠের তক্তপোষে মলিন বিছানার উপর শুইয়া মতি তার দুগ্ধহীন স্তন শলিতার মত শীর্ণ পুত্র মাণিকের মুখে তুলিয়া দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। প্রতিদিনের অভ্যাস-মত সে কলিকাটা হাতে করিয়া তামাকের উদ্দেশে বাঁশের চোঙাটার দিকে হাত বাড়াইতেছিল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল, কাল থেকে তার চোঙাতে তামাকের লেশমাত্র নাই। কাল তার পেটে অন্ন পড়ে নাই, তামাক জুটিবে কি করিয়া!

নিবারণের পায়ের শব্দ শুনিয়া গোয়াল হইতে দুইটি বলদ উসখুস করিতে লাগিল। নিবারণ প্রতিদিন ভোরে উঠিয়াই ইহাদিগকে বাহিরে বাঁধিয়া দেয়,—আজ আর কাছে গেল না। অন্য দিনের মত গোয়ালের বেড়া হইতে নিড়ানি আনিতে যাইতেছিল,—কিন্তু কি ভাবিয়া তাহাও রাখিয়া দিল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়—এই নির্জন অন্ধকারেও পাছে কেহ তাহা টের পায় এই আশঙ্কায় সে তাহা চাপিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখে, মতি তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কে রে—বউ, তুই উঠে এলি যে!

এত ভোরে তুমি কোথা চললে?

নিড়ানি রাখা আর হইল না, সেটা হাতে করিয়া নিবারণ বলিল—ঘুমটা সকালেই ভেঙে গেল, তাই ভাবলাম নিড়ানি হাতে এক বার মাঠের দিকেই যাই।

সেই অন্ধকারে মতি হাসিল। ঘুম ভাঙার কারণ সে নিজেও জানে, পেটে দানা না পড়িলে কারও চোখে ঘুম আসে না। মুখে সে রসিকতা করিয়া বলিল, মেয়ের আদর করতে তো রাত না-পোহাতেই মাঠে ছুটলে, মেয়েকে দেখে ছেলেটার কথা ভুলো না যেন, মাণিককেও কাল পেট পুরে দুটো খেতে দিতে পারি নি,—আমরা না-খেয়ে আরও দু-চার দিন কাটাতে পারি,…কিন্তু ও দুধের ছেলে—

নিবারণের এ যেন ভুলিবার কথা! সে বলিল, তুই থাম্, বউ, সে কথা তোর শেখাতে হবে না,—বলিয়া দ্বিরুক্তি না-করিয়া নিড়ানি হাতে করিয়া গামছা-কাঁধে সে মাঠের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিল।

গো-বিলের ভাগাড় ধরিয়া দু-রশি ভুঁই গিয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, মতি যেন ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মতির রসিকতার কথাগুলি যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল, মেয়েকে দেখে ছেলেটার কথা ভুলো না যেন! ধানের চারাগুলিকে সে সত্যই মেয়ের মত দেখে। এক দিন সে সে-কথা মতিকে বলিয়াছিল,—বউ, তোর যেমন মাণিক, আমার তেমন ধানের চারাগুলো, ওরা বাতাসে মাথা দুলিয়ে নাচে, আমার মনে হয়—হাজার হাজার মাণিক আমার চারি দিকে নৃত্য ক'রছে; তুই যেমন মাণিকের গা থেকে ময়লা তুলে দিয়ে সাজাস, খাওয়াস, আমিও অমনি নিড়ানি দিয়ে ওদের পাশ থেকে ঘাস-জঙ্গল ফেলে ওদের সাফ করি, ওদের গোড়া খুঁড়ে দিয়ে ওদের খাবার ব্যবস্থা করি। তাহ'লে ওরা আমার সন্তান হ'ল কি না, বল্?

মতি হাসিয়া বলিয়াছিল, তা হ'লই তো। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কেমনতর হ'ল, শুনি!

নিবারণ বলিয়াছিল, ঠাট্টা নয় বউ, আবার দেখ, মাণিক যেমন

আমার বড় হয়ে রোজগার ক'রে খাওয়াবে, ওরাও তেমনি আমায় খাওয়াবে ; মাণিকের তবু দেরি আছে, ওরা আমায় ক'দিন পরেই খেতে দেবে,—কেমন সত্যি কি না !

মতি বলিয়াছিল, সত্যি।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে নিবারণ ভাগাড়ের পথে চলিয়াছিল। পূবের আলোতে মাঠ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নিবারণ চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল, চষা মাঠে ধান ও পাটের ছোট ছোট অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। ইহার সহিত তাহার জাগুলি ধানের চারার তুলনা হয় না। ঐ—ঐ দেখা যায় তার জলকুণ্ডের জমি—আকাশের মস্ত একখানা কালো মেঘ যেন হঠাৎ মাটিতে খসিয়া পড়িয়াছে। স্বাস্থ্যে বর্ণে এ যেন মাঠের সকল ফসলকে হার মানাইয়াছে। নিবারণের মনে পড়িল, সেবার জন্মাষ্টমীর কাদামাটির কথা। কীর্ত্তনের পর পঞ্চবটীতলায় হাঁটু-সমান একটা গর্ত্ত খোঁড়া হইল—মথুর দাস একটা নারিকেল পেটের উপর রাখিয়া হাঁটু ভাঙিয়া বসিল : তাহার নিকট হইতে নারিকেল কে কাড়িবে ? রাখাল আসিল, সীতানাথ আসিল, ঝড়ু সর্দার আসিল, আরও কত কত জন—কেহ পারিল না, অবশেষে ভীম মাঝি আসিয়া এক হেঁচকায় নারিকেল কাড়িয়া লইল। মথুর দাস হারিয়া রাগিয়া বলে, এস মালাম করো আমার সঙ্গে !

ভীম হাসিয়া উঠিল, মালাম কুস্তি আপনার সঙ্গে আমি কি ক'রব দাস মশায় ! আমার ঐ ছেলে কেশব ক'রবে।...আয় তো রে কেশব, দাস-মশায়ের সঙ্গে একটু কাদামাটির খেলা ক'রে যা !

সতের বছরের ছেলে কেশব মালকোঁচা মারিয়া বুক ফুলাইয়া আগাইয়া আসিল। নিবারণ এখনও যেন তাহার চেহারা চোখের উপর দেখিতে পাইতেছে।

মথুর দাস হাঁকিল, কালি, কালি, আয় তো রে এদিকে।

কালিদাস মথুরের ভাইপো, মথুরের ডাকে মালকোঁচা মারিয়া কাদামাটির মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল।

মথুর দেমাক করিয়া কহিল, আমি আবার কি লড়ব, ছেলে-ছোকরাতেই হোক্।

এক প্যাঁচ, দুই প্যাঁচ, তিন প্যাঁচে কালিদাস চিৎ হইল।

কেশব বুক ফুলাইয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মথুর দাসের দিকে কটাক্ষ করিয়া ভীম কহিল, কেমন দাশ-মশায়,—হ'ল তো?

ষোল-সতর হইতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ-পঁচিশ পর্যন্ত যত যুবক ছিল, সকলে, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; তাহারা সকলেই প্রায় দু-এক প্যাঁচ করিয়া কেশবের সঙ্গে লড়িল। জল ঢালিয়া নূতন করিয়া কাদা করা হইল। কাদা মাখিয়া সকলে ভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু ভীম মাঝির ডব্‌কা জোয়ান ছেলে কেশবের সঙ্গে কাদামাটির খেলায় কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, এক প্যাঁচেও কেহ তাহাকে হারাইতে পারিল না। পুত্রের বিজয়-গর্বে উল্লসিত ভীম মাঝির দৃপ্ত মুখশ্রী নিবারণের বেশ মনে আছে। নিবারণ তখন ছোট; তবুও জন্মাষ্টমীর সেই আসরে দাঁড়াইয়া সারা গায়ে কাদামাখা কেশবকে দেখিয়া নিবারণের বার-বার মনে হইয়াছিল—হাঁ, ছেলে হয় তো—এমনি ছেলে!

...আজ তাহার মনে হয় তার সেদিনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। সারা মাঠের বৃষ্টির জল গড়াইয়া তার জলকুণ্ডের জমিকে কর্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, আর তাহারই মাঝে তার নিজের হাতে রোয়া জাগুলি ধানের চারাগুলি কাদা মাখিয়া হাজার হাজার কেশবের মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের হারাইতে কেহ

পারিবে না, দেবতার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ধান-পাট বাড়িয়া উঠিবে, কিন্তু আর সবার ধান যখন হাঁটুর নীচে পড়িয়া থাকিবে, নিবারণের জাগুলি ধান তখন মানুষের মাথা ছাড়াইয়া উঠিবে।

একটা লোক পিছন হইতে শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল—কেডা ও যায়?

নিবারণ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

করিম সেখ মাথাল মাথায় দিয়া কাস্তে হাতে ছুটিয়া আসিতেছে, ওঃ, দাস-মশায় না কি?

করিম নিবারণকে ধরিয়া ফেলিল, রাত না-পোহাতেও ছুটতে লেগেছ? তা ছুটবেই তো, আসমানের কালো মেঘ জমীনে নামিয়ে নেছ তুমি, তোমার দুখ্‌খু তো ঘুচল বুলে।

নিবারণ একটু হাসিল, তুমি, তুমি কোথায় চলেছ, এত ভোরে?

করিম কাস্তে দেখাইল, চারটি ঘাস আনব, গাই গরুটারে খাওয়াব, দু-সের দুধ দেয়—তিনটে পয়সাও তো হয়—ঐ দিয়ে চাল কিনে কচু-ঘেঁচু সিদ্ধ ক'রে—আল্লা যদি দিন দেয়—

নিবারণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার একটি দুধেল গাই থাকিলে আজ আর এ মুস্কিলে পড়িতে হইত না।

করিম বোধ হয় বুঝিল, বলিল, ভাবনা কি দাসমশায়, পদ্মারও তীর আছে, আল্লার কুদ্‌রতে ঐ তো তোমার ডাঙা দেখা যায়—বড় জোর আর দুটো মাস, সে আর ক-দিন? যাও ভাল ক'রে নিড়োও গিয়ে—হোই ঐ মাঠে যাচ্ছি আমি, ঐখানে ঘাস জমেছে খুব—একটু বেলা হ'লে আর কাটতে দেবে না, শালারা টের পেয়ে যাবে।

করিম চলিয়া গেল।

নিবারণ যখন তার জলকুণ্ড জমির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল,

তখন ভোর হইয়াছে। ভোরের হাওয়ায় ধানের চারাগুলি একবার মাথা দোলাইয়া নিবারণের অভ্যর্থনা করিয়া গেল। নিবারণ নিড়ানি রাখিয়া গামছা পাতিয়া বসিল: আজ আর নিড়াইয়া লাভ কি? সকালে উঠিয়াই তার চক্‌কোত্তি-মশায়ের বাড়িতে যাইবার কথা। কালো কালো ধানের চারার ভিতর দিয়া ভোরের বাতাস বহিয়া কেমন এক মধুর শব্দ করিয়া গেল, হাজার হাজার মাথা এক সঙ্গে যেন গানে তাল দিতে লাগিল। চক্‌কোত্তির বাড়িতে সে কিছুতেই যাইবে না। কিন্তু হইলে কি হইবে,—চক্‌কোত্তি হয়তো কোমরে টাকা গুঁজিয়া কাগজ-কলম লইয়া নিজেই নিবারণের বাড়িতে আসিয়া হাজির হইবে—কসাই বামুনের যদি একটুও দয়ামায়া থাকে। হাঁ টাকা সে দিয়াছে বটে,—গেল বছর চার টাকা, আর এবার দু-টাকা—সুদও কিছু হইয়াছে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে আর কিছু টাকা সে কি দিতে পারে না? আর ক-মাস,—একটা একটা করিয়া দিন গুণিলেও দু-মাস। বৈশাখ শেষ হইতে চলিল, মাঝে জ্যৈষ্ঠ মাস, আষাঢ়ের শেষেই তার ধান পাকিবে, তখন চক্‌কোত্তির টাকা নিবারণ সুদেআসলে শোধ দিতে পারিবেই—এর নাম জাগুলি ধান, সবার আগে পাকে।

কিন্তু আসল কথা তা নয়—চক্‌কোত্তি এ জমিটা চায়। ইহার পাশেই চক্‌কোত্তির ডাঙা জমি—তাহার সহিত সে এ জমি মিশাইয়া লইতে চায়। কয়েক বৎসর ধরিয়া চক্‌কোত্তি কেবল সেই সন্ধানে রহিয়াছে, সেই আশাতেই সে নিবারণকে টাকা ধার দিয়াছে। আর বৎসরও সেই প্রস্তাব সে একবার করিয়াছিল। গত বৎসরেও এমনি কালো ভোমরার মত ধান জন্মিয়াছিল—নিবারণ কত আশা করিয়াছিল। দশ বৎসর ধরিয়া এমনি এক ক্ষেত ধানের আশায় সে বছর বছর তিন টাকা করিয়া খাজনা গণিয়া আসিয়াছে। যদি বৃষ্টিতে সারা মাঠ না

ডুবাইত, তবে এই ক্ষেতের ধানেই নিবারণের সারা বছর চলিয়া আরও বাঁচিয়া যাইত। চক্কোত্তি তাই পাইয়া বসিয়াছে,—আর বছরও তো দেখলি—ধান জন্মালেই হ'ল, না? তোর ও হাতী পোষা সাজবে কেন?

নিবারণ যুক্তি দিয়াই বলিয়াছিল, ফি বছরই তো জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর-মশাই, সারা মাঠ ধুয়ে এসে আমার ভূঁয়ে লাগে—আর ক-বছর? তার পর সারা মাঠের সেরা জমি হবে আমার জলকুণ্ড।

চক্কোত্তি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, হবে, হবে—কিন্তু তত দিন কি তুই থাকবি নিবারণ?

নিবারণ বিনীত ভাবেই বলিয়াছিল, এত দিনই যদি থাকলাম, ঠাকুর-মশাই, তা হ'লে আপনারা আশীর্বাদ করলে জলকুণ্ডেতে এখন ফি বছরেই ধান ফলবে—এক রকম টিকে যাবই।

—আর বছরও তো তুই এই কথাই ভেবেছিলি, তা হ'লে আর চক্কোত্তি-মশায়ের পায়ে পড়লি কেন—টাকার জন্মে? তা হবে না, নিবারণ, এবার আমি টাকা ফেলে রাখব না, সুদে-আসলে আমার টাকা শোধ ক'রে দাও,—এবারকার টাকার দাম তুমি বুঝবে না। এবার দশ টাকা হ'লে তোমার জমির চেয়ে ঢের ভাল ভাল জমি মিলবে আমার, কিন্তু চক্কোত্তির দোরে আর টাকার জন্মে এস না, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি।

রাগিয়া, মিষ্ট কথা বলিয়া, যুক্তি দিয়া চক্কোত্তি নিবারণকে কাল সন্ধ্যায় বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছে তাহার এ-জমি এবার বিক্রি করাই ভাল। এই বছর ধরিয়া এগার বছর সে জমি কিনিয়াছে, এবারের কথা থাক, এবার ছাড়া মাত্র এক বছর সে ইহাতে ধান পাইয়াছে, অথচ জমিদারের খাজনা হইল ৩×১১=৩৩্ টাকা,

নিবারণ বুঝিয়া দেখুক। তাহা ছাড়া সেলামী দিতে হইয়াছে যেন কত?—পঁচিশ টাকা! তবে?—পঁচিশ টাকা ইহাতে নিবারণ যোগ করুক, হইল কত? আটান্ন টাকা, প্রায় ষাট টাকার বুঝ,—তিন কুড়ি টাকা। আরও কত টাকা যে ইহাতে খরচ হইবে তাহার ঠিক কি?··· আবার নিবারণের দেনা কত দেখ—এক চক্কোত্তির কাছেই নিবারণ সুদে আসলে প্রায় দশ টাকা ধারে, তা ছাড়া তিন বছর মালেকের খাজনা বাকী নয় টাকা, হইল উনিশ টাকা, চক্কোত্তি তাহাকে মোট ত্রিশ টাকা দিতে রাজি আছে এই দুর্বৎসরে। কর্জ শোধ ও খাজনা দিয়াও নিবারণের এগার টাকা বাকি থাকিবে, নিবারণ খাইয়া বাঁচিবে, চক্কোত্তি নিবারণের ভালর জন্যই বলিতেছে, নিবারণ বুঝিয়া দেখুক।

মাণিক খাইতে না পাইয়া সারাদিন কাঁদে, শুধু তাহার কথা মনে করিয়াই নিবারণের মন নরম হইয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, এই দে ঠাকুর-মশায়, হিসেব হ'ল—প্রায় ষাট টাকা খরচ হয়েছে, তা ত্রিশ টাকায় দেব?

এবার না দিলে খরচ তো আরও হ'তে থাকবে নিবারণ, সে তো আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি,—আর, এর মাঝেই তুমি ভুলে গেলে, নিবারণ,—জমি তুমি কিনেছিলে কত দিয়ে?

—পঁচিশ।

—তবে?—পঁচিশের জায়গায় ত্রিশ টাকা পাচ্ছ তুমি—পাঁচ টাকা বেশী,—তা'তে এ দুর্বৎসর!

পঁচিশের জায়গায় ত্রিশ টাকা দিয়া এ দুর্বৎসরে চক্কোত্তি-মশায় কেন এ জমি লইতে চায়, নিবারণ সবই বুঝে, কিন্তু উপায় নাই, দু-মাস কেন আর দু-দিনও মাণিককে বাঁচাইয়া রাখিবার সঙ্গতি তাহার নাই। ছ-বিঘা পাটের জমি সে আবাদ করিয়াছে, কিন্তু সে জমি তার নিজের

নয়, সে বরগা জমি, বিক্রয় করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহা ছাড়া কবে পাট বিক্রি করিয়া টাকা হইবে, তত দিন সে বাঁচিবে কি খাইয়া? নিবারণের স্ত্রী-পুত্র না থাকিলে সে বিদেশে বাহির হইয়া পড়িত। ইহাদের ছাড়িয়া সে বাড়ির বাহির হইতে পারে না।

নিবারণ কাল সন্ধ্যায় তাই রাজি হইয়াছে।

ক্ষেতের সীমানার উপর ডাঙা জমিতে একটা বুনো কুলের ঝোপ, এখনই সূর্যোদয় হইবে। নিবারণ ঝোপের আড়ালে গামছা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। দু দিন না-খাইয়া তাহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই। জাগুলি ধানের ক্ষেত দেখিয়া মনে যে বল পাইত, আজ তাহাও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বউ আসিবার সময় বলিয়াছে, মেয়েকে দেখে ছেলেটার কথা ভুলো না যেন, মাণিককে কাল পেট পুরে দুটো খেতে দিতে পারি নি। নিবারণ মনে মনে হাসিল; বউ জানে না—ছেলেকে খাওয়াইবে বলিয়া মেয়েকে সে বেচিতে বসিয়াছে।

ক্ষেতের পাশে চোখ বুজিয়া শুইয়া নিবারণ কত কথা ভাবিতে লাগিল। ঘরের বউ নিজের হাতে ছেলেপিলে মানুষ করে, তাই তারা বোঝে সন্তানের প্রতি কত মায়া হয়, চাষী যখন নিজের হাতে নিজের ক্ষেতে হাজার হাজার লাখো লাখো চারা সন্তানের মত যত্নে বাড়াইয়া তোলে, তখন তার মায়াও কি একটুখানি কম হয়! নিবারণ যখন ছোট তখন গ্রামে ছেলে বিক্রি হইতে দেখিয়াছিল। তাহাদেরই খেলার সাথী রাখালকে রাখালের মা বিক্রি করিয়া ফেলিল—নগদ পাঁচ শত টাকা। যাহারা কিনিল তাহারা জমিদার, গড়াইয়ের ও-পারে তাদের বাড়ি—বংশে পুত্রসন্তান নাই যে জমিদারী ভোগ করিবে;—আর এদিকে রাখালের মায়ের ঘরে অন্ন নাই যে খাইবে। সেদিন নিবারণের

শিশু-মন রাখালের মায়ের প্রতি বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল : এ কেমন রাক্ষসী মা, যে নিজের পেটের জন্য ছেলে বিক্রি করে! আজ যখন তাহার মনে হইল সেও রাখালের মায়ের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহার মুদ্রিত চক্ষুর পাশ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এগার বছর আগে বউয়ের বাঁধানো চুড়ি বিক্রি করিয়া তাহার সহিত পাট বিক্রির ক'টা টাকা যোগ করিয়া সে এই জমি কিনিয়াছিল, তিন বিঘা জমি মাত্র পঁচিশ টাকা। সকলের অনাদরের জমি,—জল জমে, ফসল দেয় না। নিবারণ চাষীর ছেলে—সে বুঝিয়াছিল এক দিন এই জমি মাঠের সেরা হইবে। সকল মাঠের পচানি ধুইয়া এখানে সার জমিবে, মাঠে খাল কাটা হইলে জমির জল বাহির হইয়া যাইবে,—বছরের পর বছর বর্ষার পলিমাটিতে জমি ক্রমে ডাঙা হইয়া উঠিবে, নিবারণের তিন বিঘাতে ত্রিশ বিঘার ফসল দিবে। আজ যখন তার সেই সুদিন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনই তাহাকে জমি হাতছাড়া করিতে হইল, ছেলে যখন উপার্জনক্ষম হইল, তখনই তাহাকে বিক্রয় করিতে হইল, সে রাখালের মার চেয়েও অধম।

ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া শোঁ। শোঁ। করিয়া বাতাস বহিতেছে। কি মিষ্ট ওর শব্দ,—যেন ঘুম পাড়াইয়া দেয়। অনেক দূরে—বোধ হয় কলমিডাঙার ভাগাড়ে—কোন রাখাল গান গাহিয়া চলিয়াছে—

ওরে ছিদেম সখা
আমি কি অভাবে—

বাতাসে গানের মিঠা করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছে,—সমস্ত মাঠ জুড়িয়া কালো জাগুলি ধান হাঁটু-সমান হইয়া যেন হাওয়ার তালে নাচিতেছে,—চাষার চোখে সে কত শান্তি! নিবারণের চোখে যেন

ঘুম আসিতে চায়। জাগুলি ধানের চারাগুলি যেন হাজার হাজার তালপাতার পাখা লইয়া ছোট ছেলের মত জাগরণ-ক্লান্ত নিবারণকে বাতাস দিতেছে।

প্রভাতের বাতাসে ক্ষেতের ধারে শুইয়া নিবারণ ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে এক স্বপ্ন দেখিল: দেখিল সমস্ত মাঠ যেন ধান পাটের কচি কচি চারায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার মাঝে তাহার জাগুলি ধানের চারা সবার সেরা,—তারা আরও কত বড় হইয়া উঠিয়াছে,—আরও ঘন, আরও কালো। সবাই বলে, নিবারণ পাহারা দে, পাহারা দে, এমন ধান ফললে তুই সারা বছর খেয়ে ফুরতে পারবি নে। দলে দলে সব গরু ছেড়ে দিচ্ছে,—ষাঁড় ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাস না? তুই টং বাঁধ।

লোকে ভাল কথাই বলিয়াছে। লোকের কথা-মত নিবারণ এক মস্ত উঁচু মাচা বাঁধিয়াছে। তাহার উপর সে সারা দিন বসিয়া থাকে,—বসিয়া বসিয়া সে নিজের ক্ষেতের উপর কালো ধানের নৃত্য দেখে। তাহার কেশবতী কন্যা যেন সারা আঙিনা ভরিয়া কালো চুল এলাইয়া দিনরাত নাচিয়া বেড়ায়। গরু আসিলে নিবারণ তাড়ায়—হেঁই—হেঁইয়ো। গরু তাড়াইবার জন্য নিবারণ মস্ত বড় একটা বাঁশের লাঠি করিয়াছে। সবার চেয়ে বেশী ভয় নিবারণের বিশ্বাসদের সেই ধর্মের ষাঁড়টার,—তাহার কাছে আগাইতে পারা যায় না, কাছে গেলে শিং নীচু করিয়া গুঁতাইতে আসে—নিবারণ তাহাকে তফাৎ হইতেই তাড়াইতে থাকে।

নিবারণ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—হঠাৎ শাপগুপ শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল,—নিবারণ তাকাইয়া দেখে—সর্বনাশ, বিশ্বাসদের সেই

ষাঁড়টা তাহার ক্ষেত খাইয়া কাবার করিয়া ফেলিল,—রোষে ক্ষোভে নিবারণ লাঠিহাতে মাচা হইতে লাফাইয়া পড়িল,—সে জ্ঞানহারা হইয়া ষাঁড়ের দিকে ছুটিয়া গেল। ষাঁড় হটিল না—শিঙে মাটি খুঁড়িয়া সে নিবারণের দিকে আগাইয়া আসিল,—এমন ক্ষেত ছাড়িয়া সে কিছুতেই যাইবে না। নিবারণ প্রাণপণ শক্তিতে তাহার মাথায় লাঠি মারিল। ষাঁড় এইবার ভীষণ গর্জন করিয়া নিবারণকে আক্রমণ করিল,—তাহাকে আর আস্ত রাখিবে না।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। নিবারণ দেখে, বৈশাখের খর রৌদ্র কুলগাছ ছাড়াইয়া তাহার মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে, আর তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া চক্কোত্তি তর্জন করিয়া বলিতেছে, তুই তো আচ্ছা লোক, নিবারণ, সকালবেলা তোর লেখাপড়া মিটিয়ে ফেলবার কথা,—তা না ক'রে, তুই বাড়ী থেকে পালিয়ে মাঠে এসে ঘুমচ্ছিস,—আর ওদিকে তোর ছেলেটা বউয়ের কোলে শুয়ে ভাত ভাত ক'রে হাত-পা ছুড়ছে,—আচ্ছা কাপুরুষ তো তুই,—খেতে দিতে পারবি না তো বাপ হয়েছিলি কেন?

নিবারণের ঘুম-ভাঙা চোখ দুটো চক্কোত্তির কথা শুনিয়া আরও রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল না, মাথা নীচু করিয়া নিড়ানি ও গামছা তুলিয়া লইয়া সে চক্কোত্তিকে বলিল,—চলুন। ক্ষুধায় তাহারও নাড়ি জ্বলিয়া যাইতেছিল।

দু-এক পা আসিয়া নিবারণ তার ধানের ক্ষেতের দিকে একবার তাকাইল: বৈশাখের দমকা হাওয়ায় ধানের আগাগুলি মাথা কুটিয়া কুটিয়া মরিতেছে,—তাহার মনে পড়িল, রাখালকে রাখালের মা যখন পেটের দায়ে বিক্রী করিয়া দিল, তখন সেও ঠিক এমনি করিয়া মাথা কুটিয়া কাঁদিয়াছিল।

আষাঢ় ১৩৪৬]

যশোরের কালু মিঞা

সরস্বতী পূজায় বাড়ি যাইব আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাত্র দু-দিন ছুটি। যাইতে প্রায় পুরা দিনটা লাগিয়া যাইবে; প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি বাড়ি পৌঁছিব, হয়তো সন্ধ্যা উত্তীর্ণও হইয়া যাইতে পারে। যাইয়া মা-বাপকে এক এক করিয়া প্রণাম, রাত্রে মায়ের হাতের অন্নব্যঞ্জন পরম তৃপ্তির সহিত আহার, পর দিন ভোরে আবার তাঁহাদের প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন—এই পর্যন্ত।

অথচ বাবা লিখিয়াছিলেন—সাবধান হ'য়ে আসবে, রাত্রে কখনও বাসে বা নৌকায় চ'ড়ো না। বাসে যদিও বা এস—নৌকায় কখনও রাত্রে উঠবে না। রাত্রে মাগুরায় এসে তোমার পাঁচু-কাকার বাসায় থেকো, ভোর হ'লে তবে নৌকো ছেড়ো। অভাবে দেশের লোকের স্বভাব ভাল নেই জেনো। পরশু রাতে দত্তবাড়ি চুরি হ'য়ে গেছে, আমাদের রান্নাঘরে সিঁদ কেটে যে থালা-বাসন নিয়ে গেছে সে তো তোমায় আগের পত্রেই জানিয়েছি। কোন দামী জিনিসপত্তর সঙ্গে এনো না। তোমায় আর বেশি কি লিখব—বেশ বুঝে সুঝে সাবধান হয়ে এস।

যাইবার আগে সোনার বোতাম বাক্সে তুলিয়া ঝিনুকের বোতাম-ওয়ালা একটা পুরান পাঞ্জাবী বাহির করিলাম, শীত পড়িয়া আসিয়াছিল, কোটের কোন দরকার ছিল না। ছিন্নপ্রায় যে-আলোয়ানটি রিপু করিয়া গত বৎসর গাঢ় সবুজ রং করাইয়াছিলাম সেইটিকে সঙ্গে লইলাম। বরাবর বাড়ি যাইবার সময় ছোট সুটকেস্‌টিতে দু-একখানা কাপড় বই ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই—এবার বাবার কথায় তাহা করিতে আর সাহস পাইলাম না। গ্রামে আমাদেরই পাড়ার শ্রীরাম চক্রবর্তীর ছেলে বসন্ত চক্রবর্তী যোগিনীর মাঠ দিয়া সুটকেস্‌

লইয়া বাড়ি আসিবার সময় কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল সে-খবর কলিকাতায় থাকিয়াও আমরা পাইয়াছি। সুটকেস্ খোওয়ানোই বড় কথা নয়, তাহার মত মার খাইতে আমি পারিব না। সুতরাং সুটকেস্ লওয়া আমার হইল না। ছ-আনা সিরিজের একখানা বিলাতী উপন্যাস ও শুকনো গামছাখানা খবরের কাগজে মুড়িয়া ছোট একটি পুঁটলি করিয়া লইলাম।

যশোর অবধি রিটার্ণ টিকিটের ভাড়া—বাস্ ও নৌকা ভাড়া—হিসাব করিয়া টাকা লইলাম; সঙ্গে একটি টাকাও বেশি রাখিতে চাই না।

ট্রেনের পর বাসে চাপিয়া যখন মাগুরায় পৌঁছিলাম, তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। আর একটু পরেই পূবের আলো দেখা দিল, কিছু পরেই সূর্য উঠিল।

ইহার পরেই নৌকা-ভাড়ার পালা। ঘাটে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা নৌকা বাঁধা আছে। আমাকে দেখিয়াই সবাই চীৎকার করিয়া উঠিল, বাবু, এই নৌকোয় আসেন—এই নৌকোয়—কোন্ গাঁয়ে যাবেন—বাবু—আসেন।

ভাড়া দেখিলাম অসম্ভব কম। তিন-বৈঠার নৌকার ভাড়া এক টাকা পাঁচ আনা, আগে লাগিত তিন টাকার কাছাকাছি। বাবা সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং তিন-বৈঠার নৌকা আমার ভাড়া করা হইল না। তাহা ছাড়া যে নৌকায় জোয়ান মাঝি আছে তাহার কাছেও আমি ঘেঁষিলাম না। অবশ্য জোয়ান মাঝির গায়েও কাহারও যৌবনের দীপ্তি দেখিলাম না। অবশেষে এক-বৈঠার এক 'টাপুরে' নৌকা বারো আনায় ঠিক করিয়া বেলা সাতটায় মাগুরা ছাড়িয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। নৌকার চেয়ে মাঝিকেই

আমি ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম। মাঝি বৃদ্ধ, বয়স ষাট ছাড়াইয়া সত্তরের কাছাকাছি, শীর্ণ পাকাটির মত দেহ, চক্ষু কোটরগত. হঠাৎ কোনও কারণে আক্রমণ করিলে বাঁ হাতের ধাক্কায় আমি তাহাকে জলে ফেলিয়া দিতে পারিব। হাঁ, এই মাঝিই আমার ঠিক।

খবরের কাগজ খুলিয়া গামছাখানা বাহির করিলাম, হাতমুখ ধুইয়া গামছায় মুছিলাম। বইখানাও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, গামছা রাখিয়া বইয়ের পাতা খুলিলাম। বার বার বই ও গামছা নাড়াচাড়া করিয়া মাঝিকে জানাইয়া দিলাম—ইহা ছাড়া আমার কাছে আর তৃতীয় বস্তু নাই। মাঝির সেদিকে খেয়াল আছে বলিয়া মনে হইল না। বুঝিলাম নিজের খেয়াল সে দেখাইতে চায় না,—খেয়াল দেখাইলে চুরি করা হয় না।

যাহা হউক, মাঝি বৈঠা চালাইতে থাকিল। আমি বই খুলিয়া বসিলাম, কিন্তু পড়া হইল না : মাঝির কোটরগত চক্ষুতে অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল—একটু সাবধান থাকা ভাল—বে-হুঁশিয়ার দেখিলে ঐ বৈঠার আঘাত ও যে-কোন মুহূর্তে আমার মাথায় বসাই দিতে পারে—আশ্চর্য কি !

কিন্তু মাঝির সুমুখে বই বন্ধ করিবারও উপায় ছিল না : বই বন্ধ করিলেই মাঝির মুখের দিকে নজর পড়ে, আর তার মুখের দিকে নজর পড়িলেই আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসে। লোকটা যে সত্যই বাঁচিয়া আছে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং বই খুলিয়াই রাখিলাম।

পূবের সূর্য ক্রমে মাথায় উঠিল,—মাঝির বৈঠা আর চলিতে চায় না। দুপুরে কাজলীর হাটখোলায় নৌকা বাঁধিয়া চিড়া ও মুড়কি কিনিলাম, আর গুড়ের সন্দেশ কিনিলাম। না খাইয়া নৌকায় বসিয়াও

যেন আর আগাইতে পারিতেছি না। মাঝি চিড়া-মুড়কির দিকে কেমন করিয়া তাকাইয়া ছিল—তাহাকেও চারিটি দিলাম। সে তাহা খাইয়া দুই আঁজল ভরিয়া পরম তৃপ্তির সহিত জল পান করিল।

—বিড়ি আছে বাবু?

বলিলাম, না, পান তামাক আমি কিছু খাই না।

মাঝি আর কোন কথা না বলিয়া একটা বাঁশের চোঙার ভিতর একটা কাঠি দিয়া খোঁচাইতে লাগিল; তাহার ফলে গুঁড়া গুঁড়া যাহা বাহির হইয়া আসিল তাহাতে এক বার তাহার ধূম্রপান হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহাই কলিকায় সাজিয়া নারিকেলের ছোবড়ায় আগুন ধরাইয়া লইয়া মাঝি একবার ধূম্রপান করিয়া লইল।

এইবার দেখি মাঝির বৈঠা একটু জোরে চলিতেছে। কিন্তু সে কতক্ষণ? একটু পরেই তাহার হস্ত আবার শিথিল হইয়া আসিল।

মধ্যাহ্ন-সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। আমরা তখনও শ্রীপুর ছাড়াই নাই। মাঝিকে ডাকিয়া বলিলাম, মাঝি, রাত্রের আগে কিন্তু বাড়ি পৌছান চাই।

এই প্রথম আমি মাঝির মুখে হাসি দেখিলাম। অস্তোন্মুখ সূর্যের আলো তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিলাম—শীর্ণ বিশুষ্ক বীভৎস মুখ সে উৎকট হাসিতে বিকট করিয়া বলিল, ক্যান্, বাবু, ভয় করে?

ভয় আমার সত্যই করে—কিন্তু তাহা তাহাকে বলি কি করিয়া! তাহাকে বলিলাম, না, তা নয়, মাত্র দিন দুইয়ের ছুটি, মা-বাপের কাছে যতটা বেশি সময় থাকা যায়—তাই লাভ।

উত্তরে ছোট একটি 'হুঁ' ছাড়া আর কোন শব্দ মাঝি উচ্চারণ করিল না।

যখন বাড়ি পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাবা দেখি জলচৌকিতে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, মা রান্নাঘরে।

'মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেই মা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন, বাবা 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া তাঁহার সন্ধ্যা শেষ করিলেন।

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, মা ঠাকরুণ, আমার চাল-ডাল?

লোকটা আবার পিছু পিছু আসিয়াছে কেন? ভাড়া তো চুকাইয়া দিয়াছি।

মা কিছু কথা না বলিয়া তাহাকে একজনের খাইবার মত চাল ডাল লঙ্কা তেল ইত্যাদি দিয়া দিলেন। লোকটা যেন এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

বাবা বলিলেন, পথে কোন কষ্ট হয় নি তো রে? এক বৈঠের নৌকায় এসেছিস বুঝি, তা বেশ করেছিস্, আজকাল যে দিন-কাল পড়েছে! এতক্ষণ তোর না আসা দেখে কত ভাবনা হচ্ছিল।

বাবা এইবার গল্প ফাঁদিবার উপক্রম করিতেছিলেন, মা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—সারা দিন ওর কিছু খাওয়া হয় নি, ও হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক্—তার পর গল্প কোরো।

তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাঁরে, মুড়কির মোয়া করেছি, আর কদমা আছে তাই একটু খেয়ে জল খা, আর একটু পরেই ভাত দিচ্ছি, রান্নাও আমার প্রায় হয়ে এল।

রাত্রিজাগরণ ও পথশ্রমে শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, মুড়কির দিকে আর স্পৃহা ছিল না। বলিলাম—তুমি একটু তাড়াতাড়ি রাঁধ—স্নান ক'রে আমি চারটি ভাতই খাব।

—রাত্রে স্নান করবি ?

—ও অভ্যেস আমার আছে, মা, কিচ্ছু হবে না।

বাবার একখানা কাপড় ও আমার গামছা লইয়া নদীতে চলিলাম।

ঘাটে আবার হরেনের সঙ্গে দেখা, কতদিন পরে দেখা, গল্প জমিয়া উঠিল। সে চাউলের ব্যবসা করিতেছে, দেশের যাহা অবস্থা,—আমরা নাকি কলিকাতায় ভালই আছি,—এবার এখানে লোকের যা কষ্ট, যার অবস্থা ভাল তারও চা'ল ঘরে রাখিবার উপায় নাই, এক দিনের চা'ল জমাইয়া রাখিবার উপায় নাই, চুরি হইয়া যায়। এবার দেশের ভাল লোকের স্বভাব মন্দ হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে সোনা-রূপা রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই।

কথায় কথা আসিল। আমি কেমন বিবেচনা করিয়া মাঝি নির্বাচন করিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম : তবু ভয়ে ভয়ে আসিতে হইয়াছে।

হরেন বলিল, কবে যে আষাঢ় মাস আসবে !

নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতে একটু দেরিই হইয়া গিয়াছিল। পথ হইতে দেখি—রান্নাঘরে আলো নাই, মা রান্না শেষ করিয়া সন্ধ্যা করিতে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়াছেন। রান্না হইলে বাবার আর দেরি সয় না, তিনি হয়ত আহার শেষ করিয়া লেপের মধ্যে ঢুকিয়াছেন। কি একটা গানের এক কলি আওড়াইতে আওড়াইতে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরের দিকে যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখি আমাদের বৈঠকখানা ঘরের বারান্দার পাশে কাঁঠাল গাছের নীচে একটা লোক দাঁড়াইয়া।

—কে ?

কোন উত্তর দিল না।

ভয়ে আমার সমস্ত গাঁ কাঁটা দিয়া উঠিল। কলিকাতায় গ্যাসের

আলোতে চলিয়া চলিয়া পাড়াগাঁয়ে আসিয়া রাত্রির অন্ধকারে ভাল চোখে দেখি না। দূর হইতেই উচ্চতর কণ্ঠে আবার ডাকিলাম, কে? লোকটা তবুও কোন সাড়া দিল না। কিন্তু এই বার তাহাকে একটু দেখিতে পাইলাম।

—কে—? মাঝি!—বলিয়া আগাইয়া আসিলাম; হাতে দেখি একখানা লাঠি লইয়া আসিয়াছে। রাগে সারা গা জ্বলিয়া উঠিল: পাজিটা কিছুক্ষণ আগেই আমার পিছু পিছু আসিয়া চাল-ডাল লইবার ছলে বাড়ীর সব দেখিয়া গিয়াছে। এইবার বাড়ী নির্জন দেখিয়া কাজ গোছাইতে আসিয়াছে।

ঐ শরীরে লাঠি দিয়াও ও আমার কিছু করিতে পারিবে না। রুষ্ট স্বরে 'কি চাই মাঝি' বলিয়া তাহার একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু এ তো মাঝি নয়, মাঝিরই মত শীর্ণশরীর, আরও কোটরগত চক্ষু, মুখে দাড়ি,—লোকটা ধরা পড়িয়া আর পলাইতে পারিল না। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে তুমি, কি চাই? লোকটা কথা কহিতে সাহস পাইল না।

—কেন এসেছ? এমনি করে আঁধারে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

লজ্জায় লোকটার মুখ আঁধারেও কেমন বিকৃত হইয়া উঠিল। আমার দিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিল। হাসিয়া বলিলাম—যাও, পালাও, আর দেরি কোরো না, বাবাকে ডাকলে আর পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না।…ভরসন্ধ্যেয় চুরি! চুরি করতে হ'লে একটু বুদ্ধি থাকা চাই, আমি বাড়ি এসেছি খবরটা জানা নেই বুঝি!

লোকটা তবুও নড়ে না দেখিয়া গলা ধাক্কা দিতে যাইতেছিলাম। তাহার আর দরকার হইল না; একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে

ধীরে চলিয়া গেল। আমাদের গেট পার হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া ঘোষেদের বাড়ীর পাশ দিয়া তাহার মূর্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। বাবা হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, মা আহ্নিক করিতেছেন, ব্যাপারটা লইয়া তখন আর হৈচৈ করিলাম না। হাত-পা ধুইয়া শোবার ঘরে লেপের মাঝে ঢুকিলাম। জানি, মা'র আহ্নিক সারা হইতে এখনও আধঘণ্টা দেরি। এই কাজটা করিতে তিনি এমন কি তাঁহার পুত্রকেও উপেক্ষা করিয়া চলেন।

সারাদিন উপবাসের জন্যই হউক অথবা মা'র রন্ধনের গুণেই হউক, আহারটা হইল যেন অমৃত। কত দিন পরে এমন তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নূতন ইলিশ মাছ ঘরে আসিয়াছিল। লাউয়ের সঙ্গে বড়ি দিয়া মা চমৎকার ঘণ্ট রাঁধিয়াছিলেন। নারিকেলের সন্দেশ দিয়া পাথরের বাটিতে দুধ দিয়া মা বলিলেন—এবার এই পাথরের বাটিতেই খা। তোর দুধ খাবার সেই জামবাটিটা এবার রান্নাঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে!···আরে বাবা, চোরের কি উপদ্রবই হয়েছে! তোরা তো বাড়ি থাকিস্ না,—টের পাবি কি করে?

নারিকেলের সন্দেশে একটা কামড় দিয়া, দুধের বাটিতে একটা চুমুক দিয়া বলিলাম—মা, তুমি আমার চেঁচামেচি শুনেছ—যখন তুমি ঠাকুরঘরে ছিলে?

—না, কেন, কি হয়েছিল?

এক বার ভাবিলাম মাকে আর বলিব না,—শুনিলে রাত্রিটা তাঁর উদ্বেগে কাটিবে। বলিলাম—না কিছু নয়, এমনি!

—এমনি নয়,—কি হয়েছিল—বল্!

দুধের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়া বলিলাম,—বিশেষ কিছু নয়, একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

মা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—কোথায় ?

—ঐ বৈঠকখানা ঘরের সামনে—কাঁঠাল তলায়—আঁধারে।... বেটার যেমন বুদ্ধি, এই সন্ধ্যেরাত্রে চুরি ক'রতে এসেছেন,—নড়তে পারেন না, অথচ হাতে আবার একটা লাঠি! দিতাম আচ্ছা করে ঘা-কতক বসিয়ে, বাবার যে আবার ঘুম ভেঙে যাবে,—তা ছাড়া তুমি তো সন্ধ্যে করছিলে।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, মুখে অল্প দাড়ি আছে ?

—হাঁ।

—একটু কুঁজো—না ?

—হাঁ

মা কাতর হইয়া বলিলেন, তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস ?

—হাঁ,—কেন মা!

—আহা!—মার চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল: আহা! বেচারা খেতে পায় না রে,—দিনে লজ্জা করে, তাই রাত্রে আসে, ও-পাড়ার কালু মিঞা। অবস্থা ওর একদিন ভাল ছিল, তাই রাত্রে আসে, যারা গরীব তারা দিনেও আসে। কিছু বলে না, চুপ ক'রে বসে থাকে। যারা ভদ্র গৃহস্থ, তাদের অধিকাংশ কলকাতা বা অন্য কোথাও চাকরী ক'রে দু-দশ টাকা পাঠাচ্ছে, তাই তারা দুটি খেতে পায়,—ওরা কোথায় পাবে ? ওরা এসে দোরে দোরে বসে থাকে, কিছু কথা বলে না, গৃহস্থের খাওয়া হলে যদি কিছু বাঁচে তাই তারা দেয়, ওরা আঁচলে বেঁধে ঘরে নিয়ে তাই আবার ভাগ ক'রে খায়। কিছু না পেলে আস্তে

আস্তে আপনি উঠে যায়—কথা বলে না। ভিক্ষে তো এরা কোন দিন করে নি।

মায়ের চোখ দিয়া দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

এইবার কালু মিঞার মুখখানি আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারিলাম। একটু আগে অন্ধকারের মধ্যে তার কোটরগত চক্ষুতে ধরা পড়িবার লজ্জা বলিয়া আমি যাহা ভ্রম করিয়াছিলাম তাহার স্পষ্ট অর্থ এখন আমি অনুভব করিতে পারিলাম। মাতৃপক্ক অন্নে কত দিন পরে আমি যে তৃপ্তির আহার করিয়াছিলাম, তাহা আমার একেবারে বিস্বাদ হইয়া গেল, আজ আমি একজন ক্ষুধার্তকে অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছি।

পরদিন দুপুরে হয়ত আরও দুই-একজন আমাদের বাড়িতে উদ্বৃত্ত অন্নের আশায় অধীর প্রতীক্ষায় ক্ষণ গণিবে, কিন্তু দিনের আলোতে কালু মিঞা আর আসিবে না।

দেশের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া হইতে একটা দুইটা বাজিয়া যায়। অথচ ট্রেন ধরিতে আমার অন্তত দশটার আগেই রওনা হইতে হইল। একটি ক্ষুধার্তকেও অন্ন দিয়া আমি মনের গ্লানি দূর করিবার সুযোগ পাইলাম না।

সাত-আট দিন হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। মেসের খাইবার ঘরে বন্ধুদের হৈচৈ পূর্ব্বের মত চলিতে থাকে ; আমিই কেবল তাহাতে যোগদান করিতে পারি না : আমি দেখিতে পাই আমাদের গ্রামের কালু মিঞা—কোটরগত চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টি দিয়া আমার থালার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। অন্ন উদ্বৃত্ত থাকিলে সে তার ছেলেমেয়ে স্ত্রীর জন্য আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

চৈত্র ১৩৪৫]

স্বর্গ হইতেও—

কথায় কথায় কবিতা বলা মাধবীর এক রোগ।

দেবীনগরের বাঁক ছাড়াইলেই সূর্যোদয় হইল। মাধবী তাপসের কানের কাছে মুখ রাখিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিল,

'জাগো, প্রিয়তম, জাগো—জাগো—'

তাপস অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে মাধবীর দিকে চাহিয়া আবার চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

মাধবী গাহিল,

'সজনী তোমার প্রেম-কাঙালিনী, ডাকে, সখা, জাগো—'

এইবার তাপস সত্য সত্যই চোখ মেলিল।

আরও অস্ফুট কণ্ঠে মাধবী গাহিল,

'হের—বিহগী সোহাগে জাগায়—'

তাপস এইবার মাধবীর মুখ হাত দিয়া চাপা দিয়া বলিল, পাগল, মাঝিরা কি মনে ক'রবে!

—বয়ে গেল, ওরা আমাদের চেনে না কি! তুমি ওঠ, দেখ কি সুন্দর সূর্যোদয় হয়েছে! এত আনন্দ হচ্ছে আমার, আমি গান না গেয়ে থাকতে পারছি না। মাধবী আবার সুর করিয়া কহিল,

'বেণুবনের মাথায় মাথায়
রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়,
কোথায় যে যায় ভেসে—'

তাপস হাসিয়া বলিল, এটা যে তোমার ওরিজিন্যাল হ'ল না, রবীন্দ্রনাথ থেকে চুরি ক'রলে—বঙ্গসাহিত্যে এটুকু জ্ঞান কিন্তু আমার আছে!

—বয়ে গেল ! মাধবী আবার গাহিল—

'মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে—'

—তুমি কি সত্যি পাগল হ'লে না কি ?

—হয়তো তাই ! তোমাকেও পাগল ক'রে দেব আমি। তুমি উঠলে না কেন ? আমি সেই কখন থেকে জেগে ব'সে আছি। সূর্যোদয়ের আগে এখানকার দৃশ্য কি অপূর্ব !

—তুমি প্রাণ ভরে দেখ, এ সব দৃশ্য আমি অনেক দেখেছি। কুমারের তীরে তীরেই আমার জীবনের কৈশোর আর যৌবনের প্রথম দিনগুলি কেটেছে।—বলিতে বলিতে তাপসের মুখে চোখে একটা গভীর রহস্য ঘনাইয়া আসিল—

—কাছেই কালিনগরের কাছারিতে থেকে আমি চারি বছর লেখাপড়া করেছি ; এখানকার পথঘাট, হাট-বাজার সব আমার চেনা।

মাধবী তাহা জানে। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বামী তাহার মানুষ হইয়াছে, এ খবর সে রাখে। কালিনগর হইতে সাড়ে তিন মাইল হাঁটিয়া স্বামী তাহার মাগুরার স্কুলে পড়িতে যাইত—এ কথা মাধবী অনেক দিনই শুনিয়াছে। নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছে বলিয়াই স্বামীকে মাধবী আরও বেশী করিয়া ভালবাসে। যে-যে জায়গায় তাপসের বাল্যকাল কাটিয়াছে, পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রীর মত মাধবীর নিকট সেগুলি পরম- আকর্ষণের বস্তু। কালিনগর দেখিবে বলিয়া মাধবী তাই কোন্ প্রভাত হইতে জাগিয়া বসিয়া আছে। তাপসের গাম্ভীর্য দেখিয়া মাধবী একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল, পাছে সে স্বামীর মনে কষ্ট দেয় ! অতি সাবধানে মাধবী মিনতি করিয়া

বলিল,—কালিনগর এলে আমায় ব'লো গো ; কালিনগর দেখব ব'লে আমি কখন থেকে জেগে ব'সে আছি।

ঘুমের জড়তা তাপসের চোখ-মুখ হইতে এখনও কাটে নাই। মৃদু হাসিয়া সে বলিল,—কালিনগর আমরা কখন্ ছেড়ে এসেছি।

মাধবী সে-কথা বিশ্বাস করিতে চায় না : ছেড়ে এসেছি অমনি ব'ললেই হ'ল ! নৌকো কতক্ষণ ছেড়েছে—এর মাঝেই—, তুমি ভুলে গেছ জায়গা !

তাপস হাসিল : জীবনের চার-চারটে বছর কেটেছে আমার সেই জায়গায়, ভুলব অমনি ব'ললেই হ'ল !···নদীর পশ্চিম পাড়ের গা ঘেঁসে একটা বটগাছ দেখেছ ? সেখানেই পূবের তীরে একটা ভাঙা কুঠী ?

মাধবী বলিল, একটা বটগাছ দেখেছি বটে, তবে নদীর জলে মাথা ডুবিয়ে একটা বটগাছ স্নান করছে বটে।

—আহা ! বটগাছটা তাহ'লে নদীর ভাঙনে পড়ে গেছে ! ঐ গাছের ঝুরিতে দোলনা খাটিয়ে আমরা দোল খেতাম। ছুটির দিনে স্নানের বেলা আর বিকেলে খেলার শেষে ঐখানে আমাদের ছোটদের মেলা বসত। পাশেই ছিল ফুটবলের মাঠ।

মাধবী উৎসুক হইয়া শুনিতে লাগিল।

—এক বার ঐখানে আমাদের চড়ুইভাতি হয়েছিল। আঠারখাদা —মাগুরা থেকে পর্যন্ত ছেলে এসে আমাদের চড়ুইভাতিতে যোগদান করেছিল।

মাধবী বলিল, আহা আগে যদি ব'লতে !

—কেন, কি ক'রতে ?

—আগে জানলে আমি দিনের বেলা এসে, মাগুরা থেকে চাল

ডাল নিয়ে এসে এখানে চড়ুইভাতি ক'রতাম, আর তুমি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসতে।

তাপস হাসিয়া বলিল,—তাদের অনেকে হয়তো আমায় এখন চিনতেই পারবে না, চিনতে পারলেও হয়তো আর আগেকার মত মিশতে পারবে না।...যেদিন যায় সে আর ফেরে না, এই যে নদীর স্রোত চলেছে. দেখছ তো!

মাধবী সত্যই নদীর স্রোতের দিকে তাকাইয়া দেখিল। নৌকার তলার আঘাতে জলের বুকে মধুর শব্দ উঠিতেছে। জলের ছোট ছোট বিন্দুগুলি এদিকে ওদিকে মুক্তাঝুরির মত ছিটাইয়া পড়িতেছে। মাধবী প্রথম খানিকটা তাকাইয়া দেখিল, তার পর নৌকার কিনারায় বসিয়া ধীরে ধীরে জলে পা নামাইয়া দিল।

—উঁহু,—তাপস মানা করিল।

—কেন? বেশ লাগছে!

—তা লাগুক, পা তুলে নাও।

—কেন?

—কুমীর আছে, পা কেটে নেবে।

মুহূর্তে মাধবীর মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া গেল, সে দ্রুত পা উঠাইয়া গুটাইয়া জড়সড় হইয়া বসিল: বাপ রে, আগে বলতে হয়, এমন সুন্দর জল!

—না, না, কুমীরটুমীর নেই এখানে, সে-সব নোনা জলে থাকে, খুলনা-নড়া'লের ওদিকে। আমাদের কুমারের জলকে তুমি সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব ক'রতে পার। ছেলেবেলা কত সাঁতার কেটেছি আমরা।

—তবে পা তুলতে ব'ললে.কেন?

—রাঙা পা দেখে— !

মাধবী ভ্রূকুটি করিল।

তাপস হাসিয়া বলিল, এর নাম জান তো ?

—কি ?

—কুমার।

—তা'তে কি ?

—তোমার নাম ?

— মাধবী।

—তবে ? মাধবীর রাঙা পা দেখে, কুমারের যদি লোভ হয়, তা হ'লে শ্রীমান্ তাপস দত্তের অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ কি ?

—ফাঁকি দিয়ে আমার পা তোলালে, তবে ছাড়লে !

তাপস মাধবীর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে প্রাণ খুলিয়া খানিক হাসিল, তার পর বলিল,—না মাধবী, তুমি পড়ে যাবে ব'লে আমার ভয় করে, —শুধু এই !

মাধবী সে কথার কোন জবাব না দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল ; তার পর কিছুই যেন হয় নাই, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল —নাও, এখন উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, চা খাবে।

তাপস উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া ঠিক হইতে লাগিল। মাধবী ততক্ষণ টিফিন-বাক্স খুলিয়া গরম চা-ভর্তি ফ্লাস্ক, রুটি, মাখন, জ্যাম, পেয়ালা, ডিশ, রুটি-কাটা ছুরি সব একে একে বাহির করিতে লাগিল।

যে-মাঝি নৌকার সামনে বসিয়া দাঁড় টানিতেছিল, সে এই সব অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল : মা-ঠাকরুণ, ঐ বোতলডায় কি ?

—ওতে চা আছে।

—ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি ?

—না, ওতে রাখলে গরম থাকে।

মাঝি আবার দাঁড় টানিতে লাগিল।

মাধবী রুটি কাটিয়া কোনটায় জ্যাম কোনটায় মাখন মাখাইয়া তাপসকে দিল, নিজে লইল, তার পর ফ্লাস্ক হইতে চা ঢালিল। পেয়ালায় গরম চায়ের ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল।

মাঝি দেখিয়া বলিল,—আচ্ছা কল তো!···ও মিঞা ভাই!

হালে যে বসিয়াছিল সে উত্তর দিল, কি রে করিম, ডাকিস্ ক্যান্?

—এদিক আ'সে ছাখো, গরম পানিতি কেমন ধুঁয়ো বেরোচ্ছে!

নদী সেখানে সোজা। মাঝি হাল বাঁধিয়া মাচার উপর দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যই গরম চায়ে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। তার পর যখন শুনিল—কাল তুপুরে এই চা তৈরি করা হইয়াছে, তখন তাহাদের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

তুই জনকে সামনে অমনি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মাধবী এক বার স্বামীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল, তার পর মাঝিদের বলিল —খাবে মাঝি, গরম চা আর রুটি?

মাঝিরা এ ওর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

মাধবী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, দাঁড়াও, আমাদের চা খাওয়াটা হয়ে যাক, তার পর তোমাদের দিচ্ছি,···নইলে আমাদের জুড়িয়ে যাবে!

—হাঁ, মা-ঠাকরুণ, আপনারা খায়ে নেন।

চা খাওয়া শেষ হইলে মাধবী মাঝিদের জন্ম আবার নূতন করিয়া রুটি কাটিল, জ্যাম মাখন মাখাইল। মাঝিদের জলখাবার গ্লাসে গরম চা ঢালিয়া দিল।

মাঝিরা খাইয়া বলিল—বড় ভাল খালাম, মা-ঠাকরুণ, রুটিতে বড় তার হইছে, রুটিতি মাখাইছেন এ দেব্যডা কি ?

—এ এক রকম আচার।

—বড় ভাল আচার তো! তা আপনারা শ্রীকোল কোন্ বাড়ি যাবেন ?

মাধবী স্বামীর দিকে তাকাইল।

তাপস বলিল, মধু দত্তের বাড়ি, চেন ? দক্ষিণপাড়া। তিনি এখন বেঁচে নেই, তাঁর ছেলে তাপস দত্ত, তিনিও বাড়ি থাকেন না,...বোধ হয় চিনবে না। বাড়িতে কেবল মধু দত্ত মশায়ের এক বিধবা বোন আছেন।

—আজ্ঞে বাবু চিনি, আমাগারে বাড়ি গায়েসপুর যে, নদীর এপার ওপার। ঐ যে বিধবা বোনের কথা কলেন, উনি নদীতি চান করিতে আসেন। আর ঐ যাঁনার কথা কলেন, তাপসবাবু—না কি--তিনি বিলাত গেছেন, তিনি নাকি এক মেম বিয়ে করিছেন। তাঁর বিধবা পিসী কত কাঁদেন! ছেলে লায়েক হইছে, তা পিসীকে তত্ত্বতাল্লাস করে না।

মাধবী ও তাপস পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া মৃদু হাসিল। তার পর তাপস মাঝিদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমিই সেই তাপস দত্ত, আর ইনিই আমার সেই মেমসাহেব।

মাঝি দুই জন শুনিয়া প্রথম অবাক হইয়া কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর এক জন বলিল, আজ্ঞে তা'লে লোকে যা বলে তা তো সত্যি নয়···ইনি তো মেম না, আমাগারে দেশেরই ভদ্রঘরের মেয়ে, তবে হাঁ—শ্রীম্বিত, আর ছিমছাম আছে···মেমেগারেই কাছাকাছি গা'র রং বটে!

মাধবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মাঝি বলিল, তা বাবু, অনেক দিন দেশে আসেন না, তাই চেনা-পরিচয় নেই, না হ'লে—

তাপস সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

মাঝি বিনীতভাবে বলিল, তা বাবু এখন বেতন পাওয়া হচ্ছে কত?

—ছ-শ।

—তা তো হবিই, বিলেত ঘুরে আসা হইছে.—একেবারে সাত সমুদ্দুর তের নদী!...তা পিসীরে এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান, বাবু, বড় কান্নাকাটি করেন।"

—তিনি যেতে চান না, আমি তো নিতেই চাই!...মাসে মাসে খরচ পাঠাই তাঁকে।

—তা তো পাঠাইবেনই, হাজার হলিও কত বিদ্বে আপনার পেটে!

মাঝিরা আবার নৌকা বাওয়া আরম্ভ করিলে মাধবী অনুযোগ করিয়া কহিল, এইবার শুনলে তো, পিসীমা কেমন কান্নাকাটি করেন, তুমি এত দিন আমায় শুধু ফাঁকি দিয়েছ। এবার আর আমি তোমার কথা শুনছি নে। নিজে এসেছি, নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, তবে ছাড়ব।

তাপস শুধু বলিল, আচ্ছা।

নৌকা চলিতে লাগিল। বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দুই-এক ঘাটে দেখা যাইতে লাগিল—গৃহস্থের দুই-একটি বউ ঘোমটা দিয়া

কলসী-কাঁখে জল লইতে আসিয়াছে। নৌকার মধ্যে অদ্ভুত বেশ-ভূষাধারী মাধবীকে তাহারা ঘোমটার ফাঁকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। মাধবীর বেশ কৌতুক বোধ হইতে লাগিল। কোথাও বা জেলেরা মাছ ধরিতেছে। তাজা মাছগুলি ধরা পড়িয়া লাফাইতেছে —রৌদ্রে তাদের রূপার মত গা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। নদীর পাড়ের গর্ত হইতে এক ঝাঁক গাঙশালিক উড়িয়া গেল। মাছরাঙা পাখী উপর হইতে ছোঁ মারিয়া জলে ডুব দিতেছে—বিচিত্র তাদের রং। মাধবী নৌকার বাহিরে বসিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

তাপস ছইয়ের ভিতর বসিয়া আর একটা সিগারেট ধরাইল।

যে মাঝি দাঁড় টানিতেছিল সে বলিল, মা-ঠাকরুণ, একটা গীত গান—

মাধবী তাপসের দিকে তাকাইল।

তাপস হাসিয়া বলিল, তোমাকে গান গাইতে বলছে; প্রভাতে তোমার যে কবিত্ব জেগে উঠেছিল—ওরা ধরে ফেলেছে, এইবার ঠেলা বোঝ!

মাধবী মাঝির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, তোমাদের এখানকার মেয়েরা গান গায়, মাঝি?

দাঁড় টানিতে টানিতে মাঝি বলিল, হাঁ মা-ঠাকরুণ, গায়—তবে আপনার মত অমন স্বদেশী গান গা'তি পারে না।

—আমি তো স্বদেশী গান গাই নি, মাঝি!

—না, আজকালকার গান—আপনার মত গা'তি পারে না।

তাপস ও মাধবী দুইজনেই হাসিতে লাগিল!

—তবে কি গান গায় তারা?—মাধবী জিজ্ঞাসা করিল।

—বিয়ে টিয়ে হ'লি মা-ঠাকরুণরা গীত গায়—বিয়ের গীত :—

'অতি সুন্দর রাম রে,
রামের কি দিয়ে সাজাব ?
মালী বাড়ির মুকুট এনে রামেরে সাজাব—
অতি সুন্দর রাম রে—'

এই সব গান আর কি! হাজার হ'লিও আপনার মত কি তারা গা'তি পারে—আপনি ইংরেজী পড়া মেয়ে!

পাড়াগাঁয়ের বিয়ের গানটা মাধবীর কানে কবিতার মত শুনাইল। সে স্বপ্নাতুর চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

তাপস হাসিয়া বলিল, পাড়াগাঁয়ে আমাদের বিয়ে হ'লে আমাদের বিয়ের সময়ও এই গান শোনা যেত। গায়ে-হলুদের সময় ওরা এই গান গায়।

তাপসের মুখের দিকে মুখ রাখিয়াই মাধবী বলিল, চমৎকার!

—আমাদের পাড়াগাঁয়ের প্রেমে পড়ে গেলে তুমি দেখছি।

—সত্যিই তাই।

গাঙ-না'লের কাছাকাছি আসিয়া নদীর দুই তীরে মাঠ দেখা গেল। সবুজ রঙের আকের ক্ষেত, সোনার রঙের ধানের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেতে হলুদ রঙের মেলা, তাহার মাঝে চাষী আর রাখাল ছেলেদের আনাগোনা দেখিয়া মাধবী মুগ্ধ হইয়া গেল।

গাঙ-না'লের কুটীর ঘাটে কয়েকটি ভদ্রঘরের বউ কলসী লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছে; তাহারা সকলেই প্রায় মাধবীর সমবয়সী। নিটোল স্বাস্থ্য, সুঠাম গঠন তাহাদের। জলের মধ্যে যেন কয়েকটি জীবন্ত পদ্মের মত দেখাইতেছে। মাধবী তাহাদের দেখিয়া উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাপসের দিকে চাহিয়া সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল, দেখ দেখ এরা কি সুন্দর দেখতে—

তাপস হাসিয়া বলিল, তুমিই প্রাণ ভরে দেখ, আমি দেখতে গেলে ওরা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে দেবে।

মাধবী বলিল, সত্যিই! এখনও ওরা ঘোমটা দেয়।

—তা দেয়।

—আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে ওদেরই মত কলসী ভাসিয়ে গলা-জলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে স্নান করি।

—পারবে না, ডুবে যাবে।

—সাঁতার জানলেও?

—সাঁতার জানলে অবশ্য নয়, তবে তুমি তো সাঁতার জান না!

মাধবী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, জানি না—কি রকম? কলেজ স্কোয়ারে মেয়েদের সাঁতাদের প্রতিযোগিতায় আমি রীতিমত প্রাইজ পেয়েছি!

তাপস হাসিতে লাগিল, এ সে-সাঁতারের কথা হচ্ছে না—পাড়াগাঁয়ে যে সমাজে এই সব বউয়েরা মানুষ হয়েছে সে এক সমুদ্রবিশেষ। সেখানে তুমি কিছুতেই স্থলকূল পাবে না।

—স্থলকূল পাবো না—তুমি দেখে নিও, দু-দিনের মধ্যে সবাইকে কেমন আপন করে নেব!

তাপস হাসিয়া বলিল, যাদু জান না কি তুমি!

—ঠাট্টা নয়, তুমি দেখে নিও। তুমি চাকরি থেকে অবসর নিলে তোমার গাঁয়েই আমরা ফিরে আসব!

তাপস মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে—দুপুরের কাছাকাছি কাজলীর বাঁকে আসিয়া চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া মাধবী বলিয়া উঠিল, ঠিক এই রকম একটা জায়গা দেখে আমি ছোট্ট একটি বাড়ি ক'রব।

তাপস বলিল, আর ঘণ্টাখানেক পরে দেখবে আমাদের গ্রাম এর চেয়েও সুন্দর।

—সত্যি ?

—উত্তরে কুমার, তীরে তার নীলকর সাহেবদের ভাঙা কুঠী, দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারী মাঠ, মাঠের বিলে পদ্মকুমুদের সমারোহ, নরম মাটির রাস্তার দু-ধারে বাঁশবন, কাঁঠালবাগানের মাঝে মাঝে শণখড়ে ছাওয়া মেটে ঘর। এ দৃশ্য দেখে তুমি মুগ্ধই হবে, তবে—

—তবে-টবে নয়, আমাদের এই গ্রামে ফিরে আসতেই হবে, কিছু টাকা আমার হাতে দিও, দেখো বছরকয়েকের মধ্যেই গ্রামকে আমি একটা আদর্শ গ্রাম ক'রে তুলব।

—পন্থাটা কি রকম হবে শুনি ?

—প্ল্যান সব আমার ঠিক করা আছে।

—যথা ?

—রাস্তাঘাট সব মেরামত ক'রে, জঙ্গল পুড়িয়ে, গ্রামকে স্বাস্থ্যকর, সুন্দর ক'রে তোলা হবে, গ্রামের নিরক্ষর চাষীদের—লেখাপড়া-না-জানা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে তাদের সুবিধামত বিভিন্ন সময়ে ক্লাস খোলা হবে—তাতে শেখান হবে—কৃষি, শিল্প, ধাত্রীবিদ্যা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—এ সব, আরও কত কি।

—কে শেখাবে এ-সব ?

—কেন—আমি।

—আমি কি ক'রব ?

—তুমি রবে মোর পরমারাধ্য, আমি আচার্য্য হব।

—এই যে কবিতা সুরু হ'ল! কিন্তু বুড়ো বয়সে কি তখন আর এ-সব কাব্যি ভাল লাগবে। যারা দেশের কাজ করতে চায় তারা

যৌবনেই করে। রক্তের জোর থাকতে থাকতেই তারা কাজে নেমে পড়ে। এখন যদি তুমি তোমার আশ্রমটি সুরু করতে, তা হ'লে না-হয় এক দিন দুষ্মন্ত বেশে আমি—

মাধবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে এখনও হ'তে পারে। ব্যাঙ্কে আমার নামে বাবা যে টাকা রেখেছেন তা থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে আমি তোমার পৈতৃক ভিটার কাছে কয়েক বিঘা জমি কিনে নেব, সেখানে আমার স্বপন-কুটীর গড়ে তুলব, ছুটি-ছাটাতে তুমি বাড়ি আসবে, কবে ছুটি হবে ক্যালেণ্ডারের সেই লাল তারিখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি দিন গুণব—

—আমার আসবার দিন তুমি সাজবে না?

মধুর হাসিয়া মাধবী বলিল, সেদিন আমি—কবরীতে দেব কনক চাঁপার কলি।

—আর?

—কণ্ঠে পরিব মতিয়া-বেলের মালা—

—কি কাপড় পরবে সেদিন?

—আমি—শেফালি-বৃন্ত নিঙাড়ি নিঙাড়ি রাঙায়ে পরিব শাড়ি।

তাপস হাসিয়া বলিল, আর যদি আমি না আসি, তবে মান ক'রে—চলে—যা-বে—বাপের বাড়ি?

দুই জনেই হাসিতে লাগিল।

তাপস বলিল, তোমার বাপের বাড়ির 'জিমি'র মত একটা কুকুর পুষবে না তুমি?

—না, কুকুর নয়—একটা হরিণ আর একজোড়া ময়ূর থাকবে।

—এ যে রীতিমত একটা আশ্রম হয়ে উঠল,—শকুন্তলার দুটি সখীও থাকা চাই—অনসূয়া প্রিয়ংবদা!

—তাদের তো তুমি দেখেই এলে—নদীর ঘাটে কলসী ভাসিয়ে স্নান ক'রছে। দুপুরের কাজকর্ম সেরে ওরাই সব আমার মধ্যাহ্নের সাথী হবে, গল্পগুজবের ভিতর দিয়ে ওদের আমি গ্রামের কাজের উপযোগী ক'রে তুলব।

—সন্ধ্যায় আমার কথা ভাববে বোধ হয়?

—বা-রে, আমার নাইট স্কুল আছে না, গ্রামের নিরক্ষর চাষী-মজুরদের ছেলেমেয়ে তখন আমার কাছে পড়তে আসবে যে!

—তবে আমার কথা ভাববে কখন?

—নিশীথে যখন কুমারের বুকে নামিবে চাঁদের ছায়া—বেণুবন-মাথে উতলা পবন কাঁদিয়া ফিরিবে হায়! তখন—

সম্মুখে চাহিয়া তাপস বলিল,—তখন যা হয় তুমি করো, কিন্তু আপাতত সব গোছগাছ ক'রে নাও, আমাদের উঠতে হবে এবার। ঐ, ঐ আমাদের গ্রাম দেখা যায়, ঐ ভাঙা কুঠী, তার পর ঐ রায়েদের আমবাগান, তার পর ঐ বাবলাগাছের নীচে আমাদের বাড়ির ঘাট।

মাধবী সহসা উৎফুল্ল হইয়া জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেল। হোল্ড-অলে বিছানা উঠিল। পেয়ালা রেকাবি টিফিন-বাক্সে উঠিল। সুট্‌কেস খুলিয়া আয়না চিরুণী তোয়ালে বাহির করিয়া মাধবী প্রসাধন শেষ করিল। মাধবীর মুখে চোখে আনন্দ ধরে না। সুট্‌কেস হইতে একটা কাগজে-মোড়া বড় প্যাকেট বাহির করিয়া সে তাপসের দিকে দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, তুমি এটা দেখতে পাবে না কিন্তু—

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাপস সেটা মাধবীর হাত হইতে কাড়িয়া খুলিয়া ফেলিল: একখানা ঠাস-বোনা মিহি মটকার থান।

—কি হবে?

—কি দুষ্টু! সব তাতেই তোমার কাজ? ওটা পিসীমার প্রণামী কাপড়।

তাপস কথা না বলিয়া মাধবীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

—কি, রাগ ক'রলে?

—এতে কি আমার রাগ করবার কথা!

নৌকা ক্রমে ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই মাঝির মাথায় জিনিষপত্র দিয়া মাধবী ও তাপস নৌকা হইতে নামিল। কাপড়ের প্যাকেটটা মাধবী নিজের হাতে লইল, প্রথম প্রণামের সময়ই পিসীমার হাতে দিবে। নৌকা হইতে ডাঙায় নামিয়া মাধবী যখন জুতা পরে, তাপসের এক বার মনে হইল বলে, জুতাটা না-হয় এখন না পরলে, হাতে ক'রে নাও, কিন্তু মুখে বাধিয়া গেল: কলেজে-পড়া বড়লোকের মেয়ে, খালি পায়ে চলে নাই কোনদিন!

ঘোষদের বাড়ির পাশ দিয়া আঁকাবাঁকা পথে বাড়ির সুমুখে আসিয়া তাপস মাধবীকে বলিল, তুমি একটু পেছনে এস, আমি আগে যাই!

আজ প্রায় তিন বৎসর পরে তাপস বাড়ি আসিল। কাঁঠাল-গাছের পাশ দিয়া উঠানে পা দিয়াই ডাকিল—পিসী!

অমনি একটা কান্নার রোল মাধবীর কানে আসিয়া পৌঁছিল: ওরে বাবা রে, এতদিন পরে তোর জন্মদুঃখী পিসীর কথা মনে পড়ল রে! তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার দুটো চোখ ক্ষয়ে গেল রে!

—পিসী চুপ কর, অমন ক'রে চেঁচিও না, মাঝিরা সঙ্গে আছে—মাধবী,...এক্ষুনি এসে পড়বে!

—অ্যাঁ, বউকে সঙ্গে এনেছিস্—রাক্ষুসী বউ, ডাইনী, খৃস্টানী। সেই তো আমার এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে!

তাপস চাপা গলায় বলিল, তুমি শুধু শুধু অমন চেঁচিও না, সে তো খৃস্টান নয়,—হিন্দু।

—হাঁ—হিঁদু!

—ফের যদি চীৎকার কর তবে এখনই আমি আবার নৌকায় চড়ে বউকে নিয়ে চলে যাব। বউ নিজে ইচ্ছে ক'রে এসেছে, তাকে আদর ক'রে ঘরে নাও—অনর্থ বাধিয়ো না বলছি।

প্রায় সমস্ত কথাই মাধবীর কানে গিয়া পৌছিল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

একটু পরেই তাপস ডাকিল, মাধবী!

—হাঁ।

—এস।

মাধবী এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র লইয়া দুই মাঝি উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা একদৃষ্টে ডাইনী বধূটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

—জিনিষপত্তর কো'হানে রাখব মা-ঠাকরুণ?

—ঐ উত্তরের ঘরের বারান্দায় রাখ।

তাপস বলিল, মাধবী, এই আমার পিসীমা, প্রণাম কর।

হীল-উঁচু জুতা পরা, আধা মেমসাহেবী পোষাকপরা এই মেয়েটির দিকে পিসীমা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন; মাধবী যখন মটকার থানখানা লইয়া পিসীমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে গেল, পিসীমা তখন বলিলেন, ঐখান থেকেই হবে মা, তোমরা রেলে-বাসে এসেছ—আমি এখন স্নান ক'রে রান্নাবাড়া করছি!

প্রণাম-নত মাধবী এক বার তাপসের দিকে তাকাইল। তাপস বলিল, উনি এখন ছুঁতে মানা করছেন, ঐখান থেকেই প্রণাম কর।

পরম ভক্তিভরে মাধবী পিসীমার পায়ের নিকটে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। মটকার থানখানা পিসীমার পায়ের নিকটেই রাখিল।

পিসীমা বলিলেন, ওখানা এখন উত্তরের ঘরের আড়ার উপর তুলে রাখ, পরে নেব।

তাপসের মনে হইল, পিসীমার মন যেন একটু নরম হইয়াছে। শহরের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে মাধবী যে এত নতি স্বীকার করিতে পারে তাহাও তাপস কোনদিন ভাবে নাই।

নিজেদের জিনিষপত্র উত্তরের ঘরে গুছাইয়া বাড়ির ঝি পাঁচীর মায়ের সঙ্গে মাধবী কুমারে স্নান করিতে গেল।—তাপস একটু পরে যাইবে—একসঙ্গে যাওয়া ভাল দেখায় না।

তাপসকে একা পাইয়া পিসীমা আবার কাঁদিতে বসিলেন, তিন-তিনটে বছর তোকে দেখি না বাবা, ঐ ডাইনী বউ তোকে যাদু ক'রে রেখেছে, বুকের পাঁজর গুঁড়ো ক'রে এই জন্যে তোকে মানুষ করেছিলাম!

—অযথা বউকে দোষারোপ ক'রো না পিসী, তুমি তো জান, এত দিন আমি বিদেশে কাটিয়ে এলাম।

—প্রায় ছয় মাস তো তুই দেশে ফিরেছিস!

—হাঁ, এসেছি, কিন্তু এসে চাকরি-বাকরি কিছু যোগাড় ক'রে নিতে হবে তো! ফিরে এলেই শ্বশুর চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন,—ছুটি না পেলে তো আসতে পারি না। তিনি টাকা না দিলে বিলেত যাওয়াও আমার হ'ত না, চাকরি ঠিক ক'রে না দিলে চাকরিও আমার

এত দিন জুটতো না। আমাদের কি কোন মুরুব্বির জোর আছে, তুমি সবই বোঝ তো!...

পিসী কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

—আর আমি যেন আসতে পারি নি চাকরির জন্যে, তুমিও তো যেতে চাও নি! যাবার জন্যে তোমাকে আমি তো কতবার চিঠি লিখেছি—চাকরি পাওয়ার পরেই তো আমি আলাদা বাসা করেছি।

পিসীমা কান্নার মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন, তিন কাল গেল বাবা, এখন শেষকালে ঐ খৃস্টান মাগীর হাতে খাই!

—ও তো খৃস্টান নয়, আর তুমি ওর হাতের রান্না খেতে যাবে কেন?—ঠাকুর আছে তো!

—ঠাকুর-চাকর নিয়ে তোমরা সুখে আহ্লাদে থাক, আমার ও সব খৃস্টানী চাল পোষাবে না।

—খৃস্টান খৃস্টান করছ কেন,—বলছি তো ওরা খৃস্টান নয়, খাঁটি হিন্দু।

—হাঁ, খাঁটি হিন্দু,—যত সব বিধবার কাণ্ড!

—তোমার বউ তো বিধবা নয়,—ওর মা ছিলেন বালবিধবা। বোস সাহেব হিন্দুমতেই তাঁকে বিয়ে করেন। আর এক বিয়ে তাঁর এত ছেলেবেলায় হয়েছিল যে, সে কথা তার মনেই নেই।...আর আজকাল ও সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিধবা-বিবাহ প্রাচীন কালে খুবই চলত, তা ছাড়া ঈশ্বর বিদ্যাসাগর আজকাল ওটা চালু ক'রে দিয়ে গেছেন, ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না।

—মন খারাপ হয় বাপু, তা আমি কি ক'রব বল। তা ছাড়া ওর বাপের বাড়িতে তো অখাদ্য কুখাদ্য খুবই চলে।

দূরে পাঁচীর মা'র সঙ্গে মাধবীকে দেখা গেল। তাপস পিসীকে

ইঙ্গিতে জানাইল, ও আসছে, ওর সামনে যেন এ সব কথা বলতে যেও না। তোমার এখানে তুমি ওকে থাকতে দেবে না জানি ; দু-দিনের জন্য এসেছে, দু-দিন বাদেই চলে যাবে, বাজে কথা ব'লে ওর মনে কষ্ট দিও না। একটু ভাল মুখে কথা ব'লে দেখো—কেমন লক্ষ্মী বউ ও, অত বড়লোকের মেয়ে এতটুকু দেমাক নেই—ওকে নিয়ে ঘর করলে তুমি সুখী হ'তে পারতে! ভাগ্যে নেই তোমার—কি ক'রবে বল।

মাধবী আসিয়া গেল।

পিসীমার মন বোধ করি একটু নরম হইয়াছে। মাধবীকে বলিলেন, যাও মা, উত্তরের ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরের বারান্দায় এস, কিছু মুখে দাও, নইলে পিত্তি পড়বে। আমার রান্নার কিছু দেরি হবে। তার পর তাপসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, যা, তুইও এইবার স্নান ক'রে আয়।

মধ্যাহ্নভোজনের পর মাধবী অবশ্য উত্তরের ঘরে বিশ্রাম করিল, কিন্তু অপরাহ্নেও তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে দেখা গেল না। পিসীমাই চা করিয়া দিলেন। চা খাইবার পর তাপস বলিল, একটু যাবে বেড়াতে? দক্ষিণের মাঠটা তোমাকে এক বার দেখিয়ে আনতাম!

মৃদু হাসিয়া মাধবী বলিল, না, আজ থাক ; আজ বড় ক্লান্ত লাগছে আমার।

পিসীমার সঙ্গে দু-একটা কথা অবশ্য মাধবীর হইল, কিন্তু আলাপ তেমন জমিল না। সন্ধ্যায় তাপস একটু বেড়াইয়া আসিয়া দেখিল—মাধবী হ্যারিকেন জ্বালিয়া একখানা ইংরেজী নভেল পড়িতেছে। তাপস বলিল—যাও না—পিসীমার রান্নার একটু সাহায্য কর গিয়ে।

ম্লান হাসিয়া মাধবী বলিল, কাল ক'রব।

পরদিন ভোর হইতেই তাপস বলিল, আজ মাধবী রান্না ক'রবে

পিসী—তোমার আজ ছুটি, এত দিন হাড়ভাঙা খেটেছো, এখন দু-দিন একটু জিরোও।

পিসীমা অবাক্ হইয়া বলিলেন, বউমা ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে, রান্না করবে কি গো,—রান্না আবার শিখেছে নাকি কোন দিন?

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, স্কুলে রান্নাও আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে পিসীমা,—বাড়িতেও আপনার ছেলের জন্য দুই-এক পদ আমি প্রায়ই রাঁধি।

পিসীমা যেন তত খুশী হইলেন না, বলিলেন, বেশ রাঁধো।

তাপস মাধবীকে গোপনে শিখাইয়া দিল, পিসীমার জন্যে কয়েকখানা আলুর চপ্ ক'রো—অবশ্য ঘিয়ে ভাজা। আর খাঁটি দুধের ছানা করে তা দিয়ে ডালনা করো।

মাধবী ম্লান হাসিয়া বলিল, তোমাকে শেখাতে হবে না, কি কি রাঁধতে হবে সে সব প্ল্যান করা আছে আমার।

পাঁচীর মাকে সঙ্গে লইয়া মাধবী সেদিন একটু সকাল সকালই স্নান করিতে গেল। ঘাটে আরও কয়েকটি বউ আসিয়াছে। মাধবী সেদিন পথে যেরূপ দেখিয়াছে, সেইরূপ কলসী ভাসাইয়া তাহারা স্নান করিতেছে। তীরে এক জন আধাবয়সী বিধবা মাটি দিয়া কলসী মাজিতেছেন। মাধবীর ইচ্ছা হইল, তাহাদের সহিত ভাব করে। এরাই তো তাহার অনসূয়া প্রিয়ংবদা। যে-বউটি তাহার সর্বাপেক্ষা নিকটে ছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মাধবী বলিল, তোমার নামটি কি ভাই,—কোন্ বাড়ি তোমাদের?

বউটি অস্ফুট স্বরে কি যেন বলিয়া ঘোমটা দিল। অন্যান্য বউগুলি মুচকি হাসিয়া তীরের দিকে চাহিয়া ঘোমটা দিল।

যিনি তীরে বসিয়া কলসী মাজিতেছিলেন, তিনি তর্জন করিয়া

উঠিলেন, তোরা উঠবি না লো, কখন এসে জলে পড়েছিস—উঠবার নাম নেই।

বউগুলি এইবার ত্রস্ত হইয়া উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

মাধবীর মনটা নিরুৎসাহ হইয়া গেল : কলসী মার্জনরতা বিধবা প্রৌঢ়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন।

স্নান করিয়া ঘরে গিয়া মাধবী সেদিন পিসশাশুড়ীর জন্য রাঁধিতে বসিল। তাপস মাঝে মাঝে গিয়া কি রান্না হইতেছে, খোঁজ লইতে লাগিল। মাধবী বলিল, আজ তোমাকে একেবারে নিরামিষ খাইয়ে ছাড়ব।

—বেশ তো!

রাঁধিতে রাঁধিতে মাধবীর মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল। পিসীমার জন্য সে আলুর চপ্, ছানার ডালনা, মোঁচার ঘণ্ট, বেগুনি, পটলের দম অনেক কিছু রাঁধিল। কিন্তু তাপসের খাওয়া হইলে যখন সে পিসীমাকে খাওয়াইবার জন্য ডাকিতে গেল, তখন পিসীমা মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যার পর শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। মাধবী নিকটে গেলে তিনি দুই-একবার উঁ-উঁ করিয়া বলিলেন—কে, বউমা!

—হাঁ, ভাত বেড়েছি, আপনি খেতে আসুন।

—আমি তো কিছু খেতে পারব না মা, পেটব্যথায় একেবারে মরে যাচ্ছি।···তাপসের খাওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তা'হলে তুমি খেতে ব'সো গিয়ে।

—উঠে আপনি একটুখানি মুখে দিয়ে আসুন, আপনার জন্যই এত ক'রে রাঁধলাম!

—আজ তো আমি কিছুতেই খেতে পারব না, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি;

তুমি রাগ ক'রো না, লক্ষ্মী!···তাপস খেয়েছে, তুমি খাবে, ওতেই আমার খাওয়া হ'ল।

মাধবী কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল—তাহার পর ধীরে ধীরে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না; তাপসকেও সে কিছু বলিল না, সে তো ও-ঘরে থাকিয়াও সমস্তই শুনিয়াছে, কিছু করিবার থাকিলে সে-ই করিত।

মাধবীর মনটা আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল। রান্না করিতে গিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য শুধু সে একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। বিকালে চা খাইবার পর তাপস বলিল, চল গ্রামটা তোমায় একটু দেখিয়ে আনি, বিশেষ ক'রে দক্ষিণের মাঠটা!

—চল।

তাহারা যখন রাস্তার বাহির হইল তখন রাস্তায় লোকচলাচল স্থরু হইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার মেয়েরা সব কলসী-কাঁখে রাত্রির জন্য জল আনিতে কুমারে যাইতেছে। বউরা ঘোমটার ফাঁকে আড়চোখে অদ্ভুত বেশভূষাধারী মাধবীকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। এ যেন অতিদূরের মানুষকে অতি দূর হইতে দেখা। মাধবীর ইহা তেমন ভাল লাগিল না। ইহার চেয়ে কেহ যদি তাহাকে পথের মাঝে সভ্যতা বিগর্হিত রীতিতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিত, তোমার নামটা কি ভাই—তাহা হইলে পথের মাঝেই মাধবী তাহাকে জড়াইয়া ধরিত।

রায়চৌধুরীদের কাছারির সম্মুখে চৌমাথায় কয়েক জন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল, তাপসকে দেখিয়া তাহাদের এক জন বলিয়া উঠিলেন—তাপস যে!···এত দিন পরে দেশের কথা মনে পড়ল?···ইনি বৌমা বুঝি?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাপস আগাইয়া গিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রণাম করিল।

—থাক্, থাক্,···আহা সুখী হও,···আজ বাপ যদি বেঁচে থাকত··· কত কষ্ট ক'রে গেছে বেচারা!

মাধবী অন্যদিকে মুখ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তাপস তাহাকে ইসারায় ডাকিয়া ইহাদের প্রণাম করিতে বলিল।

পাড়াগাঁয়ের রীতিতে পাছে ত্রুটি হইয়া যায়, মাধবী তাই বিশেষ নত হইয়া পায়ে হাত দিয়া ইহাদের প্রণাম করিল।

—থাক্, থাক্, সুখী হও···পথের মাঝে!···একেই বুঝি তুমি পড়াতে, তাপস?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বিধাতার যোগাযোগ, নইলে তোমার বাপের সাধ্য ছিল কি...

মাধবীর মুখ দেখিয়া মনে হইল—ইহাদের কথাগুলি সে তেমন পছন্দ করিতেছে না, তাপস তাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, আমরা তা হ'লে এখন আসি,···বেলা পড়ে এল,···গ্রামটা ওকে এক বার···

—আচ্ছা, আচ্ছা—

অল্প দূর অগ্রসর হইতেই তাপস ও মাধবী শুনিতে পাইল—তাহাদের মধ্য হইতে কে এক জন বলিতেছে—দেমাক দেখ না,··· বউকে নিয়ে সাহেবীয়ানা ক'রতে বেরিয়েছেন!...আরে বাপু, বাপ তো তোর এই রায়চৌধুরীর কাছারিতে বিশ্বম্ভর চৌধুরীর গাড়ু-গামছা টেনে গেছে,···চাল মারবি শহরে যা,···এখানে তোদের নাড়িনক্ষত্তর সব আমরা চিনি···

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাপস দেখিল—মাধবীর নয়ন-কোণ হইতে অগ্নি-

স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাপস একটিও কথা না বলিয়া মাটির দিকে মুখ করিয়া চলিতে লাগিল।

দক্ষিণের মাঠে আসিয়া প্রথমেই পড়িল 'সবরের মার' বটগাছ! এক অতি বিরাট্‌কায় বটগাছ তাহার অসংখ্য ডালপালা মেলিয়া ঝুরি নামাইয়া এক ভয়ংকর দৈত্য প্রহরীর মত যেন মাঠকে পাহারা দিতেছে। তাপস তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিল, এইখানে আমরা ছেলেবেলায় খেলতাম, ঝুরিতে ঝুরিতে বাঁধন দিয়ে দোল খেতাম,…এর ছায়ায় ব'সে ঘুড়ি ওড়াতাম।

শুনিয়া মাধবী একটু হাসিল।

—মাঠ দেখ।

মাধবীর সঙ্গে সঙ্গে তাপসও আর এক বার তার চিরপরিচিত মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিল: দূরে—পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, মাঠের পর মাঠ গিয়া চক্রবালরেখায় মিশিয়াছে। চক্ষুকে বিশেষ নিপীড়িত করিলে, শুধু একটা চক্রাকার শ্যামরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠের বুকে সোনার ধানের, যব গম মটর মসুরের শ্যামশোভার তরঙ্গ, সরিষার ফুলের রঙের ফুলঝুরি।…তখন সূর্যাস্ত হইতেছিল—পশ্চিম আকাশ হইতে একটা সোনালি ধারা সমস্ত মাঠকে প্লাবিত করিয়া দিতেছিল।

আগেকার মন থাকিলে মাধবী হয়তো পাগলের মত কয়েক কলি কবিতা আওড়াইয়া ফেলিত। কিন্তু এখন শুধু নীরবে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

তাপস এক বার জিজ্ঞাসা করিল, কেমন?

মাধবী শুধু বলিল, চমৎকার!

সূর্যাস্ত হইল।

সূর্যাস্তের পর তাহারা ভিন্ন পথে বাড়ি ফিরিতেছিল। গ্রামের মাঝ দিয়া পথ। ঘরে ঘরে সব সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাঁশবনের মাঝ দিয়া তাপস মাধবীকে লইয়া নিরালা পথের বাঁক ঘুরিতেছিল, এমন সময় সম্মুখে পড়িয়া গেল এক প্রৌঢ়া বিধবা।

—কে,...ওমা, তাপস যে!...সঙ্গে কে?—বউমা?

—পিসীমা, ভাল আছেন?—তাপস প্রণাম করিল। দেখাদেখি মাধবীও প্রণাম করিল।

—বেঁচে থাক, সুখী হও।

প্রৌঢ়া বলিলেন, তা বাবা, আমাদের কথা একবারে ভুলে গেছ, বড়লোকের জামাই হয়েছ এখন, এখন কি আর মনে থাকে?

—না পিসীমা, ভুলি নি কাউকেই,···সবে তো কাল এসেছি। ওর শরীরটা ভাল ছিল না, তাই কাল আর বেরই নি, আজ একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

—তা আমাদের বাড়ি একটু হয়ে যেতে হবে বাবা!···সৈরভী কাল বলছিল বটে!···ও স্নান করতে গিয়েছিল, এসে বললে, পিসী, তাপস-দা বাড়ি এল, নৌকোতে তাঁকে দেখলাম, সঙ্গে বউদি রয়েছে বোধ হয়!···শুনে দাদা তো একেবারে অস্থির: বউকে দেখবার জন্মে একেবারে পাগল!···উঠতে তো পারেন না, কোনও রকমে ঘর ছেড়ে বারান্দা, আর বারান্দা ছেড়ে ঘর,—কি কাল রোগেই ধরল বাবা, এক অঙ্গ একেবারে পড়ে গেছে···

—জ্যাঠামশায়ের অসুখ!

—হাঁ বাবা, তোমাকে আর তোমার বউকে দেখবার জন্তে একেবারে—

চলুন, দেখে যাই।

তাপস ও মাধবী প্রৌঢ়ার পিছু পিছু চলিল।

প্রৌঢ়া বলিয়া চলিলেন, সৈরভীকে তোমাদের ঘরে নেবার জন্যে তোমার পিসীর কি পীড়াপীড়ি!···দিলে বেশ ভালই হ'ত, তোমার পিসী আর আমি ছেলেবেলার সই,—তোমার বাবা ছিল আমাদের খেলার সাথী···সৈরভীকে দিলে বেশ ভালই হ'ত,···কি ক'রব, দাদার কিছুতেই মত হ'ল না। এখন তো পক্ষাঘাতে প'ড়ে,···কোথায় গেল সে সব জিদ্!...হাঁ বাবা, তোমার জানাশুনা একটা ছেলে, তোমারই মত ভাল চাকুরে—দেখে দিতে পার সৈরভীর জন্যে···

তাপস বলিল, আচ্ছা দেখবো।—বলিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। মাধবীর এতক্ষণ পরে একটু ভাল বোধ হইতেছিল। তাহার কৌতুক বোধ হইতেছে: সে সৈরভীকে দেখিতে পাইবে—যাহার সহিত তাপসের বিবাহের কথা হইয়াছিল।

বাড়িতে গিয়াই প্রৌঢ়া হাঁকিলেন, সৈরভী, ও সৈরভী, এই দেখ্ তোর তাপস-দা আর বউদি এসেছে, তুই পারলি নে, এই দেখ আমি ধ'রে নিয়ে এলাম!

একটি পুরু মেটে দেয়াল-দেওয়া ঘরের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, কে?

প্রৌঢ়া বলিলেন, দাদা, তাপস আর বউ এসেছে।

—বসতে দাও, তেল মালিশ হ'লে আমি আসছি।

পনর-ষোল বছরের একটি ফর্সা ছিপছিপে মেয়ে মাথা নীচু করিয়া আসিয়া বারান্দায় একটা শতরঞ্চ বিছাইয়া দিয়া গেল। মাধবী তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। লজ্জায় মেয়েটির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে দেখিয়া মাধবীর বেশ লাগিল: এই তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল! মেয়েটি উহাদের বসিতে দিয়াই পিতৃসেবা-নিরতা মায়ের কাছে কি যেন

শুনিয়া আসিল : তাহার পর আর কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেখানে বাসন-নাড়ার শব্দ শোনা গেল। জলখাবারের আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া মাধবী তাপসের দিকে চাহিল।

তাপস বলিল, পিসীমা, জ্যেঠামশায়কে একবার প্রণাম ক'রে আমরা উঠি, রাত্রি হয়ে এল।

—ব'সো বাবা, ব'সো, কত দিন পরে এলে, বউমা সঙ্গে আছেন, একটু কিছু মুখে দিয়ে যেতে হয়!

ঘর হইতে শব্দ হইল, ওদের এখানেই না-হয় পাঠিয়ে দাও, আমার মালিশ শেষ হ'তে দেরি হবে।

তাপস ও মাধবী দুই জনেই গিয়া জ্যেঠামশায় ও জ্যেঠাইমাকে প্রণাম করিল।

তক্তাপোষের পাশেই একটা মোড়া ছিল—তাহা দেখাইয়া জ্যেঠা-মহাশয় বলিলেন, ব'সো।

তাপস বারান্দা হইতে শতরঞ্চি আনিয়া পাতিয়া লইল। তাপস ও মাধবী দুই জনেই বসিল।

জ্যেঠা মহাশয়—রসিকলাল বসু—মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার নাম কি, মা?

—মাধবী।

—মাধবী!—বেশ!···ওগো, আলোটা একটু এগিয়ে দাও না, ভাল ক'রে মুখখানা দেখি!

গৃহিণী প্রদীপের সলিতা বাড়াইয়া মাধবীর মুখের কাছে আগাইয়া দিলেন! মাধবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

সৈরভী এই সময় দুইখানি রেকাবিতে নারিকেল-কোরা, চিনি, দুধের সর ও দুটি করিয়া কদমা আনিয়া তাপস ও মাধবীর সুমুখে দিল।

বসু-গৃহিণী বলিলেন, খাও মা, খাও,—আজকাল সবাই প্রায় এক-সঙ্গে বসেই খায়, বিশেষ তুমি তো কলকাতার মেয়ে!

মাধবী বসু-মহাশয়ের মুখের দিকে এক বার তাকাইয়া দেখিল : তাঁহার রোগজীর্ণ মুখে চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া বসু-মহাশয় বলিলেন, আমাদের সৈরভীর চেয়ে একটু বেশী ফর্সা নয়?...তা সৈরভীও কলকাতায় থাকলে, কলের জল গায়ে পড়লে এর চেয়ে...

তোমাদের উপাধি কি মা?

মাধবী বলিল, আমার বাবা বোস্।

তোমরাও কুলীন দেখছি, তা তোমাদের আর কুলীন মৌলিক কি?...তোমার বাবা শুনেছি সাহেবসুবো মানুষ,...তোমরা কি আর বংশটংশ মান?

মাধবী একটু চিনির সহিত নারিকেল-কোরা মুখে দিতে দিতে তাপসের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

আমাদের সৈরভীর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ওর পিসীর কত ঝুলোঝুলি : ছেলে তার বিদ্বান্!...আরে ছেলে বিদ্বান্ হ'লে কি হবে!...ও সব শহর-টহরেই চলে। এর নাম পাড়াগাঁ!...এখানে সমাজ-সামাজিকতা আছে।...কুলীনের ঘরের মেয়ে তুই নিবি, তোর বংশটা কি!...বাপ তো গেছে চৌধুরীবাবুর গাড়ু-গামছা টেনে,... আর ঠাকুরদা!...আমারই বাপের এক পানসী নৌকো ছিল তারই গুন টেনে আর দাঁড় বয়ে বয়ে তার সারাটা জীবন গেল! বলিতে বলিতে বসু-মহাশয়ের চোখ দুটি হিংস্র শ্বাপদের মত প্রদীপের স্তিমিত আলোকের মধ্যেও জ্বলিয়া উঠিল। মাধবীর মুখ হইতে দুধের সর মাটিতে পড়িয়া গেল। আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জিয়া উঠিয়া তাপস

বলিল, এমনি ক'রে অপমান করবেন বলেই কি আমাকে বাড়িতে ডেকে আনা হয়েছে? সৈরভীর বিয়ে দিতে পারেন নি, সেই ঝাল ঝাড়তে চান আমার ওপর?

বসু-মহাশয় উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে এক হাতে ভর দিয়াই উঠিতে চেষ্টা করিলেন: খবরদার ছোটলোকের বাচ্ছা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বলেছিলি—বলেছিলি তোর বংশের কথা বোস-সাহেবের কাছে? এ সব জেনে-শুনে মেয়ে দিয়েছেন তোকে?... জুচ্চুরি করিস নি তুই...বল না বুকে হাত দিয়ে? ফাঁকি দিয়ে পরের মেয়ে বিয়ে ক'রে পরের টাকায় বিলেত ঘুরে এসে এখন ফুটানি করা হচ্ছে,...এখনও দক্ষিণপাড়ার তোর জাতিগোত্র-সব 'চাই বরফ', 'চাই ল্যাংড়া আম' ব'লে কলকাতায় ফেরি ক'রে বেড়ায়,...এক দিন নিমন্ত্রণ করিস তোর শ্বশুরের বাড়িতে!

বসু-গৃহিণী স্বামীর মুখে চাপা দিয়া বলিলেন, কি সব পাগলের মত ব'কে যাচ্ছ? ভদ্রলোকের মেয়ের সামনে এ সব কি?

সৈরভীও লজ্জাসংকোচ বিসর্জন দিয়া বাপের মুখ বন্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল।

তাপস ও মাধবী তৎক্ষণাৎ মুখে জল দিয়া উঠিয়া পড়িল।

তাহারা বাড়ির বাহির হইতেই মাধবীর আঁচলে টান পড়িল, ফিরিয়া দেখে সৈরভী। সৈরভী কাঁদিয়া মাধবীর হাত ধরিয়া বলিল, কিছু মনে করবেন না আপনি, একটা কোন জোগাড়-যন্তর করতে না পেরে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে...

মাধবী সৈরভীর হাতে একটু চাপ দিয়া একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, তাহার পর দ্রুত তাপসের পাশে আগাইয়া গেল।

সারাপথ দুই জনের কোন কথাই হইল না।

বাড়ি ঢুকিবার পূর্বে মনে হইল, পিসীমা কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছেন: পুরুষের কণ্ঠস্বর। দুই জনেই থমকিয়া দাঁড়াইল। তাপস একটু পরেই বলিল, ভট্‌চায-মশায়।

কে ?

—পুরুৎঠাকুর মশাই।

অসঙ্গত হইলেও কাঁঠালগাছের আড়ালে থাকিয়া দুই জনেই তাঁহাদের কথা শুনিতে চেষ্টা করিল।

ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া পিসীমা বলিতেছেন, তাহ'লে দোষ নেই আপনি বলছেন।

বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া পুরুৎঠাকুর বলিতেছেন, না দিদি, দোষ নেই আমি বলছি। শ্রদ্ধা ক'রে যে যা দেয় তাই পরা যায়... এ তো বেটার বৌ...এমন কি যদি কোন খ্রীস্টান বা যবনেও শ্রদ্ধা ক'রে কোন শুদ্ধবাস দেয় তা অনায়াসে পরা যায় এ কথা শাস্ত্রে আছে।

মাধবীর পায়ের নীচে হইতে মাটি যেন সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। সে তাপসের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিল, আমার দেওয়া সেই থানের কথা হচ্ছে!

সেই দিনই শেষরাত্রে কুমারের বুকে স্বচ্ছ তিমিরে একখানা পানসী নৌকা দেখা গেল। পানসীখানা নদীর ভাটি মাগুরার দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। নৌকার ছইয়ের ভিতর স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া মাধবী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে: কল্লোলিনী ঝরণা আজ নীরব হইয়া গিয়াছে। তাপসও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে কে জানে! কুমারের বুকে শুইয়া হয়ত তাহারা দুই জনেই কুমারের জলধারার কথাই ভাবিতেছে: এই যে অবিশ্রান্ত

জলধারা তীব্র গতিতে সমুদ্রের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহাকে কি কোন মতেই আবার উৎসে ফিরিয়া লইতে পারা যায়?…মানুষের জীবনধারার সহিত ইহার কি কোন সাদৃশ্য নাই?…মাধবী তাহা হইলে তাহার স্বামীকে লইয়া এমন নীতিবিরুদ্ধ স্বপ্ন দেখিয়াছিল কেন?

হয়তো তাপস ভাবিতেছে: মাধবী আর তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিবে না!…কিন্তু সে কি অপরাধ করিয়াছে?…নিজের চেষ্টায় বড় হইতে যাওয়া কি পাপ!

রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। মাধবীর দুই চোখের কোণ দিয়া দুইটি শীর্ণ জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাপস তাহা নিজ হাতে মুছিয়া দিয়া বলিল: কত দুঃখই তোমায় দিলাম মাধবী!

মাধবী স্বামীর একটা হাত নিজের মুঠির মধ্যে আনিয়া বলিল, তোমার তো দোষ নেই,…তুমি তো আসতেই চাও নি, আমিই জোর ক'রে—

মাধবী আবার কাঁদিল।

তাপস আবার তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, আর বোধ হয় তুমি আমায় তেমনি ক'রে ভালবাসবে না!

পাগল!…আরও বেশী ক'রে বাসব।…তুমি নিজের চেষ্টায় এত বড় হয়েছ!

মাধবী সত্য কথা বলিল কি না কে জানে!

মহাষ্টমী

গড়াই হইতে আরম্ভ করিয়া নবগঙ্গা পর্যন্ত জলে একাকার হইয়া গেছে। গড়াইয়ের জল কুমারে, কুমারের জল নবগঙ্গায় মিশিতেছে। এক দিন যে এ পৃথিবীতে সবুজ তৃণ ও ধূসর মাটির পথ ছিল লোকে সে কথা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। মেয়েদের জল আনিতে আর নদীতে যাইতে হয় না, বাড়ির পাশে যেখানে একটু বেশি নিচু সেইখানে আর একটু খুঁড়িয়া কলসী ভরিবার ও স্নানের জায়গা করা হইয়াছে। যাহা-দের বাড়ির পাশ দিয়া 'নয়নজুলি' গিয়াছে তাহাদের আবার এ কষ্টও করিতে হয় না, তাহারা নয়নজুলিতেই কলসী ডুবাইয়া জল ভরে, নয়ন-জুলিতেই স্নান করে আবার মাছ ধরিতে সেখানেই 'বিত্তি', 'বেনে', 'দোয়াড়ি', পাতে। দক্ষিণে মাঠের দিকে যেখানে বিল আসিয়া চাষীদের বাড়ির উঠানে গা ঢালিয়া দিয়াছে সেখানে লোকে তালের ডোঙায় যাতায়াত করে, যাহাদের ডোঙ্গা নাই তাহারা বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া বাঁশের গোঁজ দিয়া ভেলা তৈয়ার করিয়া লইয়াছে; বাঁশের লগি ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া তাহাতেই এবাড়ি ওবাড়ি যায়, তাহাতেই হাট করিয়া ফিরে।

বড়দের অবর্তমানে ছোটরা ভেলা ও ডোঙা লইয়া গলিতে গলিতে খেলা করিয়া বেড়ায়, এত বড় বন্যাতেও তাহাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয় নাই।

কিন্তু বড়দের রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—যখন তাহারা তাকায় মাঠের দিকে। এত বড় যে বিল—'বড় বিলে'—তাহাতে একটু সবুজের আভা নাই, 'গো-বিলে',—'গড়ের-মাঠ'—'পদ্মবিলে'—সবই জলের তরঙ্গে ধূ-ধূ করিতেছে। মাঠের এত বড় বৈধব্যের বেশ গ্রামের অতিবড় প্রাচীনেরাও না কি দেখেন নাই, এমন কি বাপঠাকুর্দার কাছে শোনেন নাই পর্যন্ত।

'আকাল' এবার হইবেই, সুতরাং যাহাদের একটু বয়স হইয়াছে তাহারা জলের দিকে তাকাইয়া নিজের আর আপন জনের পেটের কথা ভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গিঁটওয়ালা কঞ্চি পুঁতিয়া রাখা হয়, জলের সমতলে গিঁট ; কিন্তু সকালে দেখা যায় যে গিঁট ছাড়িয়া জল একটুও কমে নাই, মাঝে মাঝে বরং গিঁট ডুবাইয়া দেয়।

চাষীরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, আল্লা কি পানিই দিল! ভদ্র-গৃহস্থেরও শঙ্কার অন্ত নাই, তাহাদের অধিকাংশের নির্ভর ঐ দক্ষিণের মাঠ, যাহাদের স্বামী পুত্র বিদেশে চাকুরী করে তাহাদেরও তাকাইয়া থাকিতে হয় ঐ দক্ষিণের মাঠের দিকে, সুতরাং তাহারাও চিন্তিত। ছেলেমহলেও চিন্তার অন্ত নাই—জল যদি এমনই থাকে তবে দুর্গাপূজায় আমোদ এবার একেবারেই হইবে না,—কলিকাতা হইতে বরেন, সুধীন, প্রতুল সবাই আসিবে, কিন্তু থিয়েটার হইবে কোথায়? পঞ্চবটীর উঠানে তো এখন জল থই থই করিতেছে, —বাগচী-বাড়ির উঠান তো এখন 'বড়-বিলে'র একটি অংশ।

রায়-বাড়ির মেজবৌ শান্তিলতার স্বামী বিদেশে চাকুরী করেন, তবু সেও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভ্রূ তার সব সময়েই কুঞ্চিত হইয়া থাকে। বড়বৌ সেদিন তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিতান্ত ভাল মনেই বলিয়াছিল,—অত ভাবিস্‌নে লো, মেজবৌ, জীব দেছেন যিনি আহার দেবেন তিনি,—আমার তো সোনার দ্যাওর, কিন্তু এ সারা গাঁয়ের মানুষগুলোর কথা ভাব দেখি একবার!

ঠোঁট উল্টাইয়া শান্তিলতা বলিয়াছিল, মাথার ঘায়েই কুকুর পাগল ; নিজের ভাবনা ভা'বেই থলকূল পাই নে,—আবার সারা গাঁয়ের ভাবনা! এট্টা লোকের উপর এতগুলো লোকের পেট,— ভা'বে ত্যাখো না। তোমার এট্টা,—আমার চারডে—ঐ রোগা

ভাসুর,—আমরা তিন তিনডে,—চা'লির দাম তো বাড়লো বুলে,—এত সব আ'সে ক'নতে ভা'বে ছাখো না একবার!

বড়বৌয়ের স্বামী রসিকের পক্ষাঘাত হইয়া এক অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, বাঁ-হাত ও বাঁ-পা তিনি নাড়িতে পারেন না, মেয়ে পনর উত্তীর্ণ হইয়া ষোলয় পা দিয়াছে, বিবাহ না দিলে চলে না, অথচ স্বামী অশক্ত, নির্ভর করিতে হইবে দেবর হেমন্তের উপর—শান্তিলতার স্বামী। তাই কথাগুলি বড়বৌয়ের তত ভাল লাগিল না, কথা সে একটাও বলিল না, কিন্তু নিজেরও অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, হায়, এবারই পূজায় সে কন্যা ঊষাকে একখানা ঢাকাই বুটীদার দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে,—ভাগ্‌গি রাঙা ঠাকুরপোকে সে এ অনুরোধ জানাইয়া চিঠি লেখে নাই।

ছোটবৌ সুহাসিনী একটি বেতের ধামিতে করিয়া চাল লইয়া এক হাতে পায়ের কাপড় তুলিয়া আধ হাঁটু জল বাঁচাইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল। মেজবৌয়ের রাগ পড়ে নাই, তাহাকে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল, ঐ তো এক জন দাদাদের কথা না শুনে সুন্দরী বৌ বিয়ে ক'রে আনলেন, কিন্তু খাতি দেয় কেডা—শুনি? কত দিন তো তুডোরেই পুষতি হ'ল—কই এক বছর তো রোজগার করতি গেছেন, এট্টা ফুটো পয়সা তো সাহায্য কর্‌তি পারলেন না! গা আমার জ্বলে যায়—

শান্তিলতার মেজাজ দেখিয়া বড়বৌ আশ্চর্য হইয়া যায়। স্বামী তার অন্নদাতা, সুতরাং মেজাজ তার হইবেই, কিন্তু জল বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ তার দিন দিন যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। পরের দেওয়া ভাত যখন খাইতে হয়, তখন কথা তাহার শুনিতে হইবেই, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ কি লাগে না? রুগ্ন স্বামীর কানে কথাগুলি পৌঁছিয়াছে

নিশ্চয়—বড়বৌ মুখ নীচু করিয়া তাহাদের পশ্চিমের ঘরে রওনা হইল। পক্ষাঘাতে তার স্বামীর অঙ্গ হয়তো চিরকালের জন্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কান ও মন হইয়াছে অধিকতর সজাগ।

রাঁধিতে বসিয়া সুহাসের বুকের ভিতরটা সেদিন কেবলই মোচড়াইতে লাগিল। প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসিল স্বামী তাহার বিদেশে গিয়াছে, এর মাঝে সে একখানা চিঠি পায় নাই। এত দিনই সে চাকরি পায় নাই—এটা কি সত্যি ? আর কতদিন সে পরের দুয়ারে দাসী-বৃত্তি করিবে, পরের লাথিঝাঁটা খাইবে ? বিশ টাকার মাহিনার চাকরিও কি এতদিন মিলিল না, তাহা দিয়াই যে সুহাস সংসার করিতে পারিত ! একখানা চিঠি লেখার পয়সাও কি তাঁর জুটে না ? —সুহাসের কান্না পাইতে লাগিল। কে জানে—হয়তো তাই ! সে তো পরের লাথি খাইয়াও দু-বেলা দু-মুঠো খাইতে পাইতেছে, কিন্তু ঐ নিতান্ত অসহায় আয়েসী জীবটি কোথায় কি খাইয়া দিন কাটাইতেছে—কে জানে। যাবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে, যত দিন কাজ না পাই বাড়ি আসব না, চিঠি লিখব না, তুমি ভেবো না। চিঠি না পেলে জেন—ভাল আছি,—অসুখ হ'লে খবর পাবে।

কিন্তু সুহাস বোঝে না—বিবাহের পর যে-লোক তার আঁচল ছাড়িয়া এক দিন কোথাও কাটাইতে পারিত না,—এক বৎসর ঘুরিয়া আসিল, এত দিন সুহাসকে না দেখিয়া, তার খবর না লইয়া সে কি করিয়া আছে !

দক্ষিণের ঘর রান্নাঘরের কাছে। সেখান হইতে কথা ভাসিয়া আসে, সুধা তার মায়ের কাছে আব্দার করিয়া বলিতেছে,—তা আমি কিছুতি শোনবো না—তা ক'য়ে দিচ্ছি,—সিল্কের ছাপা শাড়ি

আর দুড়ো চুড়ি,--আর বছর তুমি ফাঁকি দিছো, এবার কিন্তু আমি কিছুতিই ছাড়বো না।

শান্তিলতা তাহাকে চাপা গলায় ধমক দিল,—চুবো!

সুধা চুপ করিল কিন্তু মাণিক আবার সুর ধরিল,—মা, আমার এট্‌টা সিল্কের জামা দেবা,—বাগচীগারে অমূল্যর মত—দেবা—ক'ও!

আর একটি কচি কণ্ঠের স্বরও কানে আসিল,—মা, আমাল দেবা এট্‌টা!

মা কি উত্তর দেয়, বোঝা যায় না, হয়তো আদর করিয়া গালটা একটু টিপিয়া দিয়াছে।

সুহাসের মনের আর কোথাও যেন ব্যথা লাগে: অমনি নরম তুলতুলে দুটি গাল···তাহার দিকে চাহিয়া বুঝি সুহাস আর এক বেদনা কিছু ভুলিতে পারিত। সহসা সুহাসের মনে হয়—সত্য আসিবে। বিজয়ার দিন শেষ রাত্রে আসন্ন বিরহের কথা স্মরণ করিয়া সুহাস যখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, বারবার তার চোখের জল মুছাইয়া সত্য বলিয়াছিল—সে আসিবে, যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাকে সে পূজায় তাহার সুহাসের পাশে আসিবে। মা প্রসন্ন হইলে সে সুহাসকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। মা প্রসন্ন হইয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না,—সুহাসের যা কপাল! একটা ছোট কাজ জুটিলেও কি সত্য এত দিন চিঠি লিখিত না! না লিখুক, সে ফিরিয়া আসুক, তাহাকে না দেখিয়া সুহাস যে আর থাকিতে পারে না। পূজার আর কত দিন আছে—মনে মনে সুহাস একবার হিসাব করিতে থাকে, রান্নাঘরে উনানের পাশে বসিয়া দু-চোখ তাহার ঝাপসা হইয়া আসে।

আশ্বিনের শেষাশেষি নদী ও মাঠের জল কমিতে থাকে। কিন্তু এ কমায় আর লাভ কি? মাঠে চেষ্টা করিলেও সবুজের একটু আভাস

দেখিতে পাওয়া যায় না—তা না যাক্—দত্ত-বাড়ির বৈঠকখানায় 'মহানিশা'র রিহার্সেল সুরু হইয়াছে। একহাঁটু কাদা মাখিয়া নদীতে জল আনিতে যাইবার সময় মেয়েরা দত্ত-বাড়ির বৈঠকখানার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভাই, দেওর, স্বামীর কণ্ঠস্বর কান পাতিয়া শোনে।

সন্ধ্যাকালে জল আনিতে গিয়া সুহাস সেদিন কয়েক বার মহলার আওয়াজ শুনিয়া আসিল। দাঁড়াইয়া মহলা সে একেবারে শুনিতে পারে না: সত্য আজ বাড়িতে নাই। গত বৎসর সত্য মহলা সারিয়া রাত্রি করিয়া বাড়িতে আসিত বলিয়া তাহার কত কষ্ট হইত, কিন্তু সে কষ্ট এবারের তুলনায় কি?—সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া সুহাস কত কথা ভাবিল: সত্য লক্ষ্মণের পার্ট করিবার সময় উর্মিলা 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল,—তাই লইয়া সত্যকে কি ঠাট্টা! কিন্তু ঠাট্টা করিতে গিয়া সুহাস কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সত্য প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া গেল, তারপর বুঝিল, হাসিয়া বুকে টানিয়া লইয়া বলিল,—এতেই লাগে?

সুহাস সত্যর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, জানি নে যাও!

সত্য কাতুকুতু দিয়া সুহাসকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, যদি আমি আবার বিয়ে করি—তা'লে কি কর?

সুহাস রাগিয়া বলিয়াছিল, তুমি বুঝি মনে কর—আর একজন ঘরে আস্লি তার বাঁদী হয়ে থাকবো,—কুমোরে জল নেই!

সত্য সুহাসের মুখখানা দু-হাতে ধরিয়া ডিজ্ হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোকে তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থিয়েটারের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিয়াছিল, এত হিংসে!

কিন্তু ঠাট্টাই করুক আর যাহাই করুক, স্বামী তার লক্ষ্মণের পার্ট আর করে নাই,—নবমীর দিনও তো সীতা প্লে হইল!

পাগলী বুড়ী পুঁটুলি খুলিয়া বসে, তখন তার সাত রাজার ধন মানিক দেখিয়া আশ আর মেটে না,—সুহাস সারা রাত ধরিয়া স্বামীর ভালবাসার কথা ভাবিল। দেরি আর সয় না, পূজার আর কত দেরি?

শান্তিলতার ঘুম হইতে উঠিতে একটু দেরি হয়, ছেলেপিলে লইয়া বাস তার,—সুহাসই সকালে উঠিয়া ঘরের কাজ সারে, ফেন-ভাত রাঁধিয়া ছোটদের খাওয়ায়, নিজে খায়। কিন্তু সেদিন রৌদ্র উঠিলে মেজবৌ যখন ঘুম হইতে উঠিয়া গেল সুহাস তখন অকাতরে ঘুমাইতেছে, যাইবার সময় মেজবৌ ঠোঁট উল্টাইয়া একটা ভ্রূকুটি করিয়া গেল।

এত বেলায় সুহাস কোনদিন উঠে নাই, সারারাত ঘুম হয় নাই, প্রভাতের সময় চোখ দুইটি ভার হইয়া আসিয়াছিল। লজ্জিত সন্ত্রস্ত সুহাস ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, পশ্চিমের ঘরে বড়বৌ স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করিতেছে, রান্নাঘরের দাওয়ায় সকলে ফেন-ভাত খাইতে বসিয়াছে—উষা ভাতে সিদ্ধ কাঁঠালের বিচিতে তেল-নুন মাখাইতেছে। শান্তিলতা একটা পিঁড়িতে বসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে উষার উপর তর্জন করিতেছেন, বুড়ো ধাড়ি মেয়ে হ'লি, একটু কাজের কাজি হলি নে,—রাঁ'ধে দিলাম, মা'খে খাতি পারিস নে,—আগে নুনির সঙ্গে লঙ্কা চট্‌কাতি হয় না?

আজ মেজবৌ নিজে ফেন-ভাত রাঁধিয়াছে, আবার তেল মাখিয়া দুপুরের রান্না রাঁধিবার জোগাড় করিতেছে,—সুহাস লজ্জায় মরিয়া ছুটিয়া গিয়া উষাকে বলিল, উষা সরো, আমি মাখ্‌তিছি।

শান্তিলতা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিল, থাক্ থাক্ আর আধিক্কে দেখাতি হবি নে, ওই পারবে—পরের ঘরে যা'য়ে ওর আর রাঁধতিও হবি নে,—আর এত কাল আমরা রাঁ'ধেও খাই নি!

উষা কাঁঠালের বিচি মাখিয়া ভাগ করিতেছিল, মেজবৌ তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, ভাগ করতিও শেখো নি,—ওটা—ওটা কার ভাগ হ'ল শুনি,—তোমার ছোট-কাকীমার? তোমার ছোট-কাকীমার অত-টুকু হলি হয় নাকি,—অত এক ড্যাং ভাত গেলা হ'বে নে কেমন ক'রে শুনি!

মেজবৌয়ের স্বামীর উপার্জ্জনের অন্ন তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়—কিন্তু দুটি ভাত খাইতে দিয়া যে লোকে এমন করিয়া কথা শুনায়, তাহা ভাবিয়া সুহাসের কান্না পাইতে লাগিল। ছেলেবেলায় মা বাপ হারাইয়া গরিব পিসীর কাছে মানুষ হইয়াছে সে, কিন্তু ভাতের জন্য কথা কোনদিন শুনিতে হয় নাই তার, বরং কিসে দুটি ভাত বেশী করিয়া খাইবে চিরদিন সেই চেষ্টাই করিয়াছে পিসী। আজ সে ইহাদের কোন কাজ করিতে পারিল না—তাহাদের দেওয়া অনাদরের অন্ন সে কি করিয়া গ্রহণ করিবে? একটা মিথ্যা অসুখের অজুহাত দেখাইয়া সে এবেলা উপবাস করিবে কি-না সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় মুক্তি দিল আসিয়া মিত্তির-বাড়ির মেয়ে সুরমা। আহ্লাদে গলিয়া পড়িয়া সে বলিয়া উঠিল, ওগো রায়-বাড়ির লোকজন, কেমন আছ সব? তার পর সুহাসকে দেখিতে পাইয়া, তাহার গলা ধরিয়া বলিল, এই যে ছোটগিন্নী,—এই দিক্ আ'সো দেখি, এক ঘড়া জল দাও, পায়ে যা কাদা লাগিছে তা এক ঘটির কাম না—বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে উত্তরের ঘরে লইয়া গেল। যাইতে যাইতে সুহাস বলিল, কবে আ'লে?

আমি আবার 'তুমি' হ'লাম নাকি তোর?—সুরমা বলিল—বলিয়া তার সুডৌল হাতে একটি চিমটি কাটিল।

সুহাসের মনটা হালকা হইয়া আসিতেছিল, এতদিন পরে মনের কথা বলিবার একটি লোক পাইয়া সে যেন একটু বাঁচিয়াছে, সেও একটি দুষ্টামির কথা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় মেজবৌয়ের স্বর কানে গেল,—চল্‌লে তো!—আমারে একেবারে উদ্ধার করে গেলেই হ'ত—আবার ভাত আগলায়ে ব'সে থাকবি?

সুহাসের স্বচ্ছন্দ ভাব কাটিয়া গেল, সুরমার বাহুমুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, উষা, আমার ভাত কয়ডা ঢা'কে রাখ্‌ মা, আমি পরে খাবো।

সুরমা তাহাতে আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে আর কিছু বলিতে সুযোগ পাইল না, রান্নাঘর হইতে মেজবৌয়ের তীরের ফলার মত চোখা-চোখা কথা কানে আসিয়া বিঁধিল, রাজরাণী আমাগারে—রাজরাণী হুকুম করতিছেন,—বুলি, কয়ডা দাসী বাঁদী আছে আপনার শুনি?—এক বাঁদী রাঁ'ধে দিল, এক বাঁদী ঢা'কে রাখপে—বাঁদীই আবার রাণীর খাবারের জোগাড় করতি চলল। নায়কা এ্যাহোন সই-সয়লা নিয়ে পীরিত করতি চললেন—তবু তোর সোয়ামীর অন্ন যদি খাতি হতো আমাগারে!—বুলি—

নি-নায়েরের নায়ের বড়
ঠ্যাটা ঢেঁকির বাখ্যি বড়—

সেই বিত্তান্ত! পরের সোয়ামীর রোজগার খায়েই এই,—নিজির সোয়ামীর রোজগার যদি খাতি, তা'লি ত ধরারে সরা জ্ঞানই করতি নে!

পরের মেয়ে সুরমা আজ এ-বাড়িতে আসিয়াছে, তাহার সম্মুখে

সুহাস এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সুরমার সম্মুখে তাহাকে কটূক্তি করিলে অপমানটা সুরমারও কম করা হয় না—সুহাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। বড় ভাসুর পশ্চিমের বারান্দায় শুইয়া আছেন, জবাবটা এখান থেকে দেওয়া চলে না, সুহাস রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া আসিয়া বাঁকা-বেড়া ছাড়াইয়া আসিল। কাল রাত্রিটা সুহাসের একেবারে ভাল কাটে নাই, এত দিনের সংযমের বাঁধ ভাসাইয়া সুহাসের মুখে কথার বান ছুটিল, দিদি, ঠ্যাটা ঢেঁকির বাম্ভি বড়—এ কথা ঠিক, কিন্তু তাতে লাথি না মারলি তো বাজে না,—নায়েরও আমার বড় না,—নায়ের থাকলি আর আপনাদের এখানে থা'কে লাথি ঝাঁটা খা'তাম না,—দেওর আপনার রোজগার করতি পারে না, কিন্তু রোজগারের তল্লাসেই তো এক বছর বাড়িছাড়া। আপনারাই বলেন, বয়স তার এই বিশ ছাড়াল, এ-বয়সে আপনাগেরে গাঁয়ের কোন্ ছেলেডা চাকরি করে ঘরে টাকা আনতিছে শুনি? আপনার সোয়ামীর রোজগার খা'য়ে পয়মাল্ করলাম—শুনতি শুনতি কান ঝালাপালা হয়ে গেল—মানষির গন্ধ পালি ভেমাক্ আপনার দশগুণ বা'ড়ে যায়—কিন্তু আপনি বুকি হাত দে বোলেন দেখি, তাঁর কয়ডা টাকা আমরা খা'য়ে থা'কি? টাকা যা আসে তা তো আপনি বাক্‌সে তোলেন। দুই হাটের দিন দু-চার পয়সার মাছ ছাড়া কি কেনা হয় আমাগারে শুনি? আমি জানি শ্বশুর ঠাকুর স্বগ্‌গে যাবার আগে তিরিশ বিঘে মাঠান্ ক'রে গেছেন, তা'তে সোনার ফসল ফলে, বাগিচের আম কাঁঠাল বিক্রি ক'রে টাকা আসে, পাটের টাকা আসে, সে সব ক'নে যায়?—পেট তো আমার এটুটি,—পাঁচটি নিয়ে আপনার যদি চলে, তা'লি আমার একার পেটও চলবি —আমার ভাগের আম কাঁঠালের, পাটের দামেই আমার তেল নুন কাপড়ের দাম চলে যাবি।

সুহাসের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সুরমা পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ তেলের বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রায় লাফ দিয়া উঠানে নামিয়া আসিল, কি, কি বললি?—ভেন্ন হতি চাও,—বেশ আসুক বাড়ি এবার, তাই ক'রে দেবো, দেবো, দেবো,—এই তিন সত্যি র'লো।

সুরমা সুহাসের হাত ধরিয়া টানিল, সুহাস নড়িতে চায় না, বলে, এ সংসারে চাড্‌ডি খাই, তাও মাঙনা না,—সকাল থেকে রাত্তির দেড় পহর পর্যন্ত বাঁদীগিরি করি—তাই।

বড়বৌ পশ্চিমের বারান্দা হইতে স্বামীসেবায় ক্ষণেক বিরাম দিয়া নামিয়া আসিয়া সুহাসের হাত ধরিল, ছোটবৌ, পাগল হলি তুই, আয় এদিকে আয়—বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

রুদ্ধ আক্রোশে মেজবৌ চীৎকার করিতে লাগিল, সব্বনাশী,—সব্বনাশী সংসারটারে একেবারে খাবি—ঠাকুরপোর সব্বনাশ করিছে—এবার সংসারটারে খাবি।

সুহাস বড়বৌয়ের হাত ছাড়াইয়া আবার ছুটিয়া আসিল, আপনার ঠাকুরপোর কি সব্বনাশ করলাম আমি—শুনি!

মেজবৌ আগাইয়া দাঁড়াইল, করলি নে? তুই আ'সে তার লেখাপড়া করতি দিলি? তিন তিন বার ফেল করলো সে—এর আগে কোন দিন ফেল করিছে? তোর রূপিই তো পুড়ে মলো সে!

সুহাস এবার কাঁদিয়া ফেলিল—তার নিজের স্বামীর সর্বনাশের কারণ সে—স্বামী তার ফেল সত্যই করিয়াছে—এ কথা সে ঝগড়া করিতে গিয়াও উল্টাইবে কি করিয়া? বড়বৌয়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, আপনারা আমারে এ-বাড়িতে ক্যান্ আনিছিলেন?

জবাব দিল মেজবৌ, ওলো ডাইনি—তোমারে এ বাড়িতি আমরা

কেউই আনি নি, তুমি যারে নজর দিছলে—কিপাদিষ্টি করিছিলে লো—সে-ই সঙ্গে ক'রে আনিছে।

সুহাস কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল সুরমা তার মুখ আটকাইয়া ধরিয়া বলিল, "ফের কথা বলবি তো কিল খাবি,...... বড়বৌদি—ওরে আমাগেরে বাড়ি নিয়ে চললাম, বিকেল বেলা দিয়ে যাবো—বলিয়া আর কারও কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া জলকাদার পথে একরূপ হিড়হিড় করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

সুহাস যখন বৈকালে বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন বাড়ির সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—মেজকর্ত্তা হেমন্ত বাড়ি আসিয়াছেন: মেজবৌয়ের মুখের কঠিন রেখা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। একদিন বর্ষা পাইয়া—শীর্ণ নীরস পুঁইডাটা যেমনি করিয়া সজীব হইয়া উঠে মেজ-বৌয়ের মুখ আজ তাই; সুহাসকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, ওলো তুই আইছিস, আমি তো উষারে পাঠানোর জোগাড় করতিছিলাম,—এমন নেমত্তন্নো খাওয়াও দেখি নি!...উনি তো আ'সেই খোঁজ করতিছেন ছোটবৌ কই—ছোটবৌ কই?

মেজবৌয়ের আকস্মিক এ পরিবর্ত্তনের কারণ জানিবার মত বয়স সুহাসের হইয়াছে, সেও হাসিল, হাসিয়া ভাসুরের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

—আ'সো মা লক্ষ্মী, আ'সেই আমি মা লক্ষ্মীরে খুঁজিছি, শরীর ভালই আছে—না মা?

সুহাস মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ,—লজ্জাও তাহার করিল,—শরীর তাহার তবে এমনই ভাল হইয়াছে যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না যে তুমি কেমন আছ? সুরমা পোড়ারমুখী আবার তাহাকে

চুল বাঁধিয়া স্নো ঘষিয়া সং সাজাইয়া দিয়াছে। নিজের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করিয়া মাথা তাহার আরও নীচু হইতে চলিল।

হেমন্ত তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা তুমি এখন আ'সো, মা। সুহাস চলিতে আরম্ভ করিল, সুরমা পোড়ারমুখী আবার এমন কাদার পথেও তাহাকে আলতা পরাইয়া দিয়াছে।

হেমন্ত জলচৌকীতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, ছোটবৌয়ের দিকে চাহিয়া, একবার ধূম উদ্গীরণ করিয়া পরম স্নেহে বলিলেন, মা লক্ষী তো আমাগারে বাড়ি বাঁধাই পড়িছেন মেজবৌ—আমাগারে আবার ভাবনা কি ?

মেজবৌয়ের মুখ ভার হইয়া উঠিল, সুহাস মুখ না ফিরাইয়াও তাহা বুঝিতে পারিল—তা উঠুক,—ভাসুরের স্নেহে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। রান্নাঘরে যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল ভাসুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সে পাগলাডা আসবি কবে—কিছু জান ?

—কেডা জানে !

—চিঠিপত্তর ল্যাখে নি কোন ?

—তাই বা জানবো কেমন ক'রে আমি ?

—থিয়েটার হচ্ছে না গাঁয়ে ?

—হুঁ।

সুহাস একটা প্রাণখোলা হাসি শুনিতে পাইল, তা'লি আর না আসে পারতিছেন না বাছাধন !

সুহাসের মনটার কোথায় যেন একটু স্বস্তি হইতেছিল: অন্তত একটি লোক এ-বাড়িতে তাহার পক্ষে বলিয়া বোধ হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাদা-ভরা উঠানেই আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের নূতন কাপড় আসিয়াছে। মাণিক পিছন

হইতে সুহাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কাকীমা, কাকাবাবু আসপি কবে? কাকাবাবু থিয়েটার করবি নে এবার?

সুহাস তাহাকে কোলে লইয়া তাহার গালটা একবার টিপিয়া দিল। উষা রান্নাঘরের বারান্দার এক পাশে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল, দাঁতের এক পাশ দিয়া চুলের ফিতা কামড়াইয়া ধরিয়া আর এক পাশ দিয়া কহিল, কাকীমা, তোমার একখানা খাসা বুটিদার আইছে, —নীল রঙের। আমার একখানা আইছে চাঁপা রঙের। বড় কাকাবাবু বল্লেন—তোর ছোট কাকীর রং ফরসা—তার নীল রঙে মানাবি ভাল।

এক জন তাহাকে এমন করিয়া আদর করে মনে মনে—সুহাসের আনন্দে কান্না পায়—চিরদুঃখিনী সে, আজ কত দিন পরে তাহার বাপের কথা মনে পড়ে। ভাসুরের এমন স্নেহ পাইয়াছে সে, মেজ-বৌয়ের সকল অপরাধ সে ক্ষমা করে, সকালের সকল গ্লানি ভুলিয়া যায়।

মেজবৌয়ের রাগ তেমন নাই, সুতরাং এবেলা আর সে জিদ করিয়া রাঁধিতে যাইবে না, সুতরাং সুহাস রাত্রের রান্নার জোগাড় করিতে উঠিবে, এমন সময় এক জন ভিখারী একহাঁটু কাদা মাখিয়া "হরেকৃষ্ণ!" বলিয়া উঠানে দাঁড়াইল। নীচের কাপড় তার উঠাইয়া কোমরে গোঁজা, সুতরাং কাদা ধুইবার প্রয়োজন বোধ না করিয়াই সে বেহালায় টান দিল,—চারি দিক হইতে ছেলেপিলে ছুটিয়া আসিল। বৈরাগী বেহালায় সুর দিয়া ধরিল—

—ওরে ছিদেম সখা—

বড়বৌ পশ্চিমের ঘরের বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল, বরোগী-ঠাকুর শোন!

বৈরাগী থামিল।

—এ্যাট্টা আগমনী গাও দেখি।

বৈরাগী বলিল, মা ঠাওরুণ, তালি এক ঘটি জল আর একখানা আসন ছান।

উষার চুল বাঁধা হইয়াছিল, সে এক ঘটি জল আর একটা ছোট জলচৌকী আনিয়া দিল। বৈরাগী পা ধুইয়া আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বেহালার সঙ্গে গাহিল—

> গিরিবর হে, এই তো শরৎ আইল,
> উমারে আনিবে কবে—স্বরূপে তাই বলো বলো।
> হেম শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষারি অন্ত
> পঞ্চ ঋতুতে পঞ্চত্ব-প্রায় হয়েছিলাম—
> দেহেতে পাইব কণো, প্রাণ ছিল সেই জন্যে
> হেরিয়ে হইব ধন্যে সেই শ্রীমুখমণ্ডল।
> গিরিবর হে—এ—

বৈরাগীর গলা ভাল, গায়ও খুব দরদ দিয়া, শুনিয়া বয়স্কেরা চোখের জল মুছিল। সুহাস উঠিয়া রান্নাঘরে গেল।

সেদিন রাত্রে সুহাসকে উত্তরের ঘরে শুইতে হইল,—ভাসুর বাড়িতে আসিয়াছেন, আজ তার দক্ষিণের ঘরে মেজবৌয়ের কাছে শোওয়া চলে না। কিন্তু উত্তরের ঘরের যা অবস্থা তাহাতে দিনের বেলায়ও সেখানে ঢুকিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। কিছু দিন আগে বন্যায় কুমারের জলের ঢেউ লাগিয়া মেটে পোতা ধ্বসিয়া গিয়াছে, মাণিক একদিন কি খেলার জিনিষ খুঁজিতে আসিয়া এ ঘরে একটা শেয়াল দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে শোনা গেল এতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কারণ নদীর ওপারে জোঁকার চক্রবর্তী-বাড়ির দক্ষিণের পোতার ঘরে বাঘ ও সাপ এক সঙ্গে নির্বিবাদে বাস

করিতেছে। বাঘটাকে এখনও কেহ মারে নাই বটে, কিন্তু সেও কাহাকে কিছু বলে নাই—বন্যায় সেও তার হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছে।

এ সংবাদ সুহাসের জানা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একা সে উত্তরের ঘরে থাকিতে সাহস করে না, কারণ বাঘের চেয়ে হিংস্র জীবও জগতে আছে। প্রথমে কথা হইল উষা তাহার ছোটকাকীমার কাছে শুইবে, স্বীকারও সে করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার আগে কেমন করিয়া কে জানে তাহার মতটা হঠাৎ বদলাইয়া গেল। সুহাস মনে মনে সত্যই একটু বিপদ গণিল।

কিন্তু বিপদে ভড়কাইয়া যাইবার মেয়ে সে নয়। ঘরের এক কোণে সাজানো কাঁঠালের বড় বড় পিঁড়িগুলি টানিয়া ধ্বসিয়া-যাওয়া ছিদ্রগুলি বন্ধ করিল, তক্তপোষের নীচের হাঁড়িগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ঘরে এক পাশে রাখিল কতক বা বারান্দায় বাহির করিয়া দিল। এক বছর পরে সে এ ঘরে শুইতে আসিতেছে—এ ঘরে শেষ শুইয়াছে সে গত বিজয়া-দশমীর রাত্রে—পাশে ছিল তার স্বামী। আজ কাজ করিতে করিতে সেদিনের কথা তার কেবলই মনে পড়িতেছে, আর মনে পড়িতেছে তার বৈরাগী-ঠাকুরের কথাগুলি—

* * *

হেম শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষাদি অন্ত
পঞ্চ ঋতুতে পঞ্চত্ব-প্রায় হয়েছিলাম—

.

হেরিয়ে হইব ধন্য সেই শ্রীমুখমণ্ডল।

মা সে হয় নাই, কন্যার বিরহ সে জানে না, স্বামীর অদর্শন-যন্ত্রণা যে কি সে কথা ভাল করিয়াই সে জানে। সহসা তার মায়ের কথা

মনে হইল, মা বাঁচিয়া থাকিলে সেও বুঝি তাহাকে দেখিবার জন্য এমনি করিয়া পাগল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে মেজবৌয়ের এত কটূক্তি সে সহ্য করিত না। সুহাস সত্যই বড় দুঃখিনী।

সুহাসের মনের অবস্থা ক্রমেই এমন হইয়া আসিতেছিল যে এখনই হয়তো বিছানা করা রাখিয়া তক্তপোষের এক কোণে বসিয়া নির্জন ঘরে সে কাঁদিতে বসিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, শীতান্তের দমকা হাওয়ার মত প্রবেশ করিল সুরমা।

—কই রে—কি কাপড় পালি তুই দেখি!

—কাপড়, কই পাই নি তো—তুমি শুনলে ক'নতে?

—চালাকি—এই উষা যে ঘাটে বুলে আ'লো তোমার জরির বুটীদার নীলাম্বরী আইছে—রাঙা রঙে মানাবি ভাল?

সুহাস কোন উত্তর দিল না। সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে সুরমা প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারে নাই, এখন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, তুই কাঁদতিছিস্ না কি রে, আবার কি হ'ল তোর—এ-ঘরে বিছানা করতিছিস্ ক্যান্?

—শোব।

—মাইরি?

—ভাসুর ঠাকুর আইছেন যে, দক্ষিণির ঘরে শোব কেমন ক'রে?

—ভয় করবি না নে?

সুহাস হাসিল,—ভয় করলি আর কি করব বল।

সুরমা কহিল, আমি আজ আসে থাকপো, দুই-এক দিন আসে' থাকতি পারব—তার পরে কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, উনি আসতিছেন কি না?

সুহাস একটু হাসিয়া বলিল, তাই না কি, কবে?

সুহাসের মুখের দিকে চাহিয়া সুরমা বলিল, কিন্তু তুই কি আজকের ডাকেও কোন চিঠি পালি নে?

সুহাস বলিল, না ভাই, একখান ছাড়া চিঠি আর ল্যাখেন নি।

—তোর কি মনে হয় পূজোতে তিনি আসপেন না?

—মিছে কথা তো তিনি আমার কাছে বোলেন নি,—বুলিছিলেন তো পূজোর সময় দেখা হবি।—সুহাসের চোখ হইতে দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সুরমার স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া দু-দিন থাকিতে পারে না, হয়তো কাল পরশু আসিয়া উপস্থিত হইবে—সুহাসকে সে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ভাবিতেছিল—এমন সময় মাণিক আসিয়া জামরঙের অতি সাধারণ একখানা শাড়ি সুহাসের হাতে দিয়া কহিল, কাকীমা, তোমার কাপড় ন্যাও।

সুরমা ও সুহাস দুই জনই অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাযি করিল।

—তোর এই কাপড়?

সুহাস হাসিল, তাই তো দেখ্‌তিছি।

—তয় যে শোনলাম তোর নীলাম্বরী আইছে?

—আমিও তো শুনিছিলাম ভাসুরের মুখে তাই।

—তুইও তাই শুনিছিলি?—

মাণিক কাপড় দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া সুরমা বলিল, মণি শোন!

মাণিক দাঁড়াইল।

সুরমা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার গায়ে মাথায়

হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মাণিক, একখানা নীলাম্বরী শাড়ি আইছিল, দেখিছিস তুই ?

মাণিক মাথা নাড়িয়া জানাইল, হুঁ।

—সেখান কি হ'ল রে ?

—সেখান নীলু মাসীমার জন্যি মা বাক্‌সে উঠোয়ে থুইছে।

—তোর বাবা বুল্‌লো বুঝি ?

—না, মা ক'লো ওটা মাসীমারে দিবি, বাবা বারণ করলো, মা শুন্‌লো না। মা কতি মানা ক'রে দেছে।

সুরমা মাণিককে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "আচ্ছা তুমি যাও, আমরা কারু কাছে কবো না।

কথাটা শুনিয়া সুহাস শুধু স্তব্ধ হইয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, সুহাসের জীবন আরও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ভাসুর হেমন্তের হাবভাব এ কয় দিনে অসম্ভব বদলাইয়া গিয়াছে : প্রথম দিন তাঁহার নিকট হইতে যে স্নেহের সুর সুহাস অনুভব করিয়াছিল সে যেন স্বপ্নের কথা। সুহাসের বিরুদ্ধে অনেক কথা তাহার কানে গিয়াছে। সুরমা এত দিন সুহাসকে আগলাইতে আসিত, আজ পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বর আসিয়াছে, সে রাত্রে আর আসিতে পারিবে না ; তবুও সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া রাত্রিটা এক প্রকার কাটিয়া যাইত! উষাকেও সুহাস ডাকিবে না।

আজ সপ্তমী—স্বামী পূজায় বাড়ি আসিবে এ প্রত্যাশা সুহাস ছাড়িয়া দিয়াছে, আসিলে এত দিন আসিত। আশ্চর্য!—সুহাসের

হাসি পায়, এ জগতের সকলেই সমান! আশা সে আর করে না, তবু তার অবাধ্য পা দুটি মোটরলঞ্চের ভেঁপু শুনিলে কর্দমাক্ত পথে নদীর ঘাটে ছুটিয়া আসে। কলসী কাঁখে লইয়া স্নান করিবার সময় সে এইটিই বাছিয়া লইয়াছে। শত অজুহাতে স্নান করিবার সময় সে পিছাইয়া দেয় এই ভেঁপু শুনিবার আশে।

সপ্তমীর দিনও সুহাস কলসী লইয়া জলে নামিল। মোটর লঞ্চ এখনও দূরে রহিয়াছে—সুহাস গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে শব্দের তরঙ্গের সহিত জলের তরঙ্গ তুলিয়া বোট সুহাসের সম্মুখ দিয়া ষ্টেশন-ঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিল, কে একটা লোক যেন ছাউনি হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুহাসের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল—স্বামী তার কখনও মিছে কথা বলে না—না, এ সত্য তো নয়! লোকটি তবুও এই দিকে তাকাইয়া আছে—লোকটা বেহায়া তো কম নয়!—এই দিকে তাকাইয়াই সে চীৎকার করিয়া বলিল, যাবেন একবার, আপনাদের সত্যর খবর আছে। সুহাস পিছনে ফিরিয়া দেখে মেজবৌ কলসী কাঁখে করিয়া উপরে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি আরও কি যেন বলিল, কিন্তু ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া মোটর তখন ঘনঘন ভেঁপু বাজাইতেছে, —কথা কানে গেল না।

সুহাস একটু যেন বল পাইল, নিজের অজ্ঞাতেই একবার মেজ-বৌয়ের দিকে তাকাইল।

—আমি যাব বিকেলে খবর আনতি—চন্দর-বাড়ির ভৈরবের বর ও,—ভৈরবের নিয়ে আ'লো বুঝি—

সুহাসের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। ভৈরব না কি সুহাসের চেয়ে সামান্য বড়। স্বামী তার সুহাসের স্বামীর সঙ্গে একত্র থিয়েটার

করিয়াছে, সুহাসের ইচ্ছা করিতে লাগিল সে নিজে গিয়াই খবরটা জানিয়া আসে, কিন্তু কি লজ্জা—নিজের স্বামী!

বিকালে মাণিককে সঙ্গে করিয়া মেজবৌ চন্দ-বাড়ি গেল। সুহাস অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল। মেজবৌ হয়তো আসিয়া বলিবে, ঠাকুরপো কাল আসপি,—অতুলির সঙ্গে দেখা হইছিল তার।—সুহাস মেজবৌয়ের পায়ে পড়িবে নাকি—দিদি আমারে ক্ষমা করেন,—কত অপরাধ করিছি আপনার কাছে!

কিন্তু মেজবৌ আর আসে না!—সুরমা সন্ধ্যাকালে দিব্য সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া উপস্থিত—সকালে তার বর আসিয়াছে।

—কি গো ছোট গিন্নী,—বুলি খবর কি?

সুহাস তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। অনেক কাল পরে সুরমা সুহাসের মুখে হাসি দেখিল: কিছু খবর আইছে বুঝি?

—না, খবর আনতি গেছেন।

—কেডা?

—মেজদি।

—মেজদি?

—হেঁ।

—ক'নে গেলেন তিনি খবর আনতি?

সুহাস সুরমাকে রান্নাঘরের বারান্দা হইতে উত্তরের ঘরে লইয়া স্নান করিবার সময়কার সেই ছোট কথাটি ফেনাইয়া ফেনাইয়া বিস্তারিত করিয়া বলিল। সুরমা বলিল, তাই নাকি।

সুহাস মৃদু হাসিয়া বলিল, হেঁ।

মাণিকের কণ্ঠস্বর কানে গেল। দুই বন্ধু আকুল আগ্রহে সত্যর সংবাদ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল, সুহাসের বুক ঢিব্‌ঢিব্‌

করিতে লাগিল, কিন্তু মেজবৌ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। একটু পরে শোনা গেল—বড়বৌয়ের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা হইতেছে। সুরমা শেষে উঠিয়া গিয়া মেজবৌয়ের পাশে দাঁড়াইল।

—কোন খবর পালেন সত্যদার ?

মেজবৌ কোন উত্তর করিল না।

কি, কথা বোলেন না যে !—সুরমা মেজবৌকে বাঁকাবেড়ার ওদিকে আড়ালে লইয়া গেল ; সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি কথা হইল—সুহাস দম বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল—এখন প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—সে বার-বার মা দুর্গার কাছে জানাইল।

সুরমা গম্ভীর মুখে ফিরিয়া আসিলে সুহাস তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, প্রাণে বাঁ'চে আছেন ত ?

সুরমা সুহাসের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, হাঁ।

—আলেন না ক্যান ?

—তিনি হাজতে।

—ক্যান ?

—তা, আর না শুনলে।—সুরমা সুহাসের পাশে বসিয়া তাহার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সুহাস বলিল, তুমি ব'ল,—পাষাণ হয়ে গিছি আমি, বল।

সুরমা কিছু না বলিয়া সুহাসের পিঠের উপর নিজের মুখখানা নত করিল।

দুঃখ পাইলে ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝি প্রখর হয় ; পশ্চিমের ঘর হইতে চাপা গলার কথা কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল : এমন কেলেঙ্কারী যে হবি তা আমি আগেই জানিতাম,—সুন্দরের দিক টান কি ঠাকুরপোর !

—এই বংশে শেষে খুনী লোক জন্মালো ?

—না খুন আর করে নি, করতি গিছলো, খুন করলি তো ফাঁসিই হ'ত ।

সুরমাও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিল না, বড়বৌ, মেজবৌও না, তবু সকলের ছোট ছোট আলোচনা হইতে সুহাস বুঝিল, স্বামী তাহার খবরের কাগজের ফিরি করিয়া দিন চালাইত। যেখানে থাকিত তাহার পাশে সুন্দরী বিধবা বোন লইয়া আর এক জন গরিব কেরাণী বাস করিত। সেই সুন্দরী বিধবা ও তার স্বামীর মাঝে প্রণয় হয়। স্বামী তাহাকে লইয়া পলাইয়া যায়, ধরা পড়ে,—মেয়েটির ভাইকে স্বামী মারিতে যায় তার পর হয় মকদ্দমা, ফলে জেল দুই বৎসর।

শুনিয়া প্রথমে সুহাস পাষাণের মতই হইয়া গেল, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। সুরমা তাহার পাশেই বসিয়া ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর সুরমাকে ডাকিতে লোক আসিল। সুরমা সুহাসের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, তা'লে আমি উঠি ?

সুহাস দু-হাতে সুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরমা যখন চলিয়া গেল তখন রাত্রি এক প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। সে আজ পাশে থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহা তো হইবে না, তাহার স্বামী আসিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সুহাসকে কিছু খাওয়ানো গেল না।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া উষা দেখিল কাকীমা ঘরে নাই। সে মনে করিল, কাকীমা হয়তো একটু আগে উঠিয়া গিয়াছে।

মেজবৌ উষাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর ছোট কাকী কই রে!

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উষা বলিল, আমি উঠে তারে দেখি নি তো!

মেজবৌ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কি যেন খুঁজিল, তার পর তাহা না দেখিয়া ধীরে ধীরে কাঁঠালের পিঁড়িগুলি এক পাশে সরাইয়া সেখানকার মাটি পা দিয়া আরও খানিক ধ্বসাইয়া দিল।

শান্ত গাম্ভীর্য লইয়া ঘর হইতে একটা গেলাস হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া মেজবৌ উষাকে বলিল, তোর ছোট কাকী বোধ হয় সুরমাদের ওহানে গেছে।

—হ'তি পারে।

যখন একটু রৌদ্র উঠিয়াছে, দত্ত-বাড়ির সন্তোষ ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, ঘাটের ডা'ন দিক পিটেপৌড়া গাছের ঠিক নীচে যে গইন্ জল না—হ্যাথানে—ক্যাবোল কাছিম উঠতিছে! শুনিয়া মাণিক ও সুধা ছুটিয়া গেল।

বড়বৌ খানিক পরে উত্তরের ঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তোমরা ছোট বৌয়েরও খোঁজ করলে না—এদিক ছ্যাখো—বেড়া তো একেবারে ফাঁক।

মেজকর্তা, মেজবৌ, উষা সকলে ছুটিয়া আসিল।

তাই তো!

মেজবৌ মেজকর্তার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কি সব্বনাশ, কেলেঙ্কারীর আর অন্ত র'লো না,—কি দেখতিছো—তোমাদের লালমণ্ যে ছিকলী কাটিছেন।

মেজকর্তার চক্ষু ক্রমে কপালে উঠিতেছিল।

বড়বৌ বলিল, একবার ঘাটটা খোঁজ ক'রে দেখলি হয়,—কাছিম উঠতিছে বলে···কাল বড় দুখখু পাইছে!

উঠানে শব্দ হইল, ও: বৌদি।

বড়বৌ ও মেজকর্তা আগাইয়া আসিল। উষা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা,—ছোট কাকা যে!

সত্য একটা বড় কাপড়ের বোঁচকা বারান্দায় রাখিয়া বৌদি ও দাদাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, একটা চাকরি এই পূজোর মাঝেই হবার কথা ছিল, তাই কাল অতুলের কাছে খবর পাঠাই-ছিলাম,—পূজোয় আর বাড়ি যাব না। তা কাজডা এখন আর হ'ল না—তাই চলে আলাম। নৌকোয় আলাম্ তাই সকাল সকাল। তার পর সব ভাল তো!

কাহারও মুখে আর কথা সরে না।

কাহারও কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মেজবৌ একটা কলসী কাঁখে লইয়া বলিল, তোমরা ব'স, আমি সুরমাদের অখান থে ছোটবৌয়ের একটা খবর দিয়ে চট্ ক'রে ডুবডা দিয়ে আসি—বলিয়া বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

চন্দ-বাড়ি পূজা। ভৈরব একটা ঘরে বসিয়া নৈবেদ্যের জন্য ফল কাটিতেছিল। মেজবৌ পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল, তার পর ভৈরবের পায়ের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল, ভৈরব, তুই আমারে বাঁচা।

ভৈরব বঁটি ছাড়িয়া উঠিল, বুক তাহার কাঁপিতে লাগিল: এ কি কর বৌদি, তুমি কি পাগল হ'লে, কি হইছে?

মেজবৌ চাপা গলায় বলিল, অতুল ক'নে ?

—তিনি তো আজ সকালের মোটরে কলকাতা চলে গেছেন।

মেজবৌ এইবার একটু সামলাইয়া লইল, যা'ক অতুলকে তো সাক্ষী মানিতে পারিবে না।

মেজবৌ ভৈরবের দুটি হাত ধরিয়া এবার আব্দার করিয়া কহিল, এট্টা অনুরোধ রাখতি হবি ভৈরব, চিরকাল আমি কেনা হ'য়ে থাক্‌বো।

ভৈরব হাসিয়া বলিল, কি ?

মেজবৌ বলিল, ঠাকুরপো আজ এই মাত্র বাড়ি আইছে। আমি কাল ঠাকুরপো পূজোয় আসপে না শুনে বাড়ি যা'য়ে ঠাট্টা ক'রে বুলিছিলাম—তার জেল হইছে।

—তা'তে আর কি হইছে ?

—না কিছু হয় নি, ঠাকুরপো আবার জিজ্ঞাসা করতি আসতি পারে কি না !

—তা, আসে আসুক !

—তাই তো কচ্ছি,—যদি আসে তা'লি তোমার একটা কাজ করতি হবি।

—কি, বলো—ভৈরব মেজবৌয়ের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মেজবৌয়ের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, যদি 'না' বলে! তাহার পর জোর করিয়া ভৈরবের হাত ধরিয়া বলিল—যদি আ'সে জিগ্‌গেস করে, দিদি লক্ষ্মী,—বলো—অতুলের কথা, বলো উনার বন্ধু কি না—উনি ঠাট্টা ক'রে কইছিলেন—জেল হইছে—বৌদি তাই সত্যি মনে করে গেছেন।

ভৈরব হাসিয়া বলিল; আচ্ছা।

—আচ্ছা না, বল দুগ্‌গার কিরে।

ভৈরব বলিল, দুগ্‌গার কিরে।

মেজবৌ এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দুর্গামণ্ডপে সদ্যস্নাতা শুদ্ধবসনা মেয়েরা পূজার নৈবেদ্য লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—আজ মহাষ্টমী। মেজবৌ গলায় কাপড় দিয়া এক পাশে নত হইয়া প্রার্থনা করিল, মা আজ মহাষ্টমী, যে যা কামনা করে তার সেই বাঞ্ছা পূরণ ক'রো তুমি। ছোটবৌ যে জলে ডুবে মরিছে—এতে যেন আমাগারে কোন অমঙ্গল হয় না, মা। তুমি তো জান সে মরবি বুলে এমন কথা কই নি আমি।

প্রার্থনা নিবেদনকালে মেজবৌ এক মুহূর্ত থামিল, তার পর বলিল, আর—আর ছোটবৌ যখন আর এ জগতে নেই, তখন ঠাকুরপোর মন শান্ত করে দাও তুমি, আর—আর মা জগজ্জননী গো—আমার ছোট বোন নীলি যেন আমাগারে ঘরে আসে—এবার যেন ঠাকুরপো তারে বিয়ে করতি আর 'না' না করে।—ভাবাবেশে মেজবৌয়ের চোখ হইতে দু-ফোঁটা জল মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

প্রণাম শেষ করিয়া মেজবৌ যখন বাড়ি রওয়ানা হইল, তখন তাহার শরীর কাঁপিতেছে। এত বড় একটা সংকট হইতে মা তাহাকে রক্ষা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনের গোপন কোণে নীলির আগমনী-সুর ধ্বনিত হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা—সুহাসের জন্য এ বাড়িতে কাঁদিবার কেহ নাই, তাহার পর বেড়া ভাঙিয়া মাটি ধ্বসাইয়া ঘটনার যে রূপ সে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাতে বংশের একটু কলঙ্ক হইলেও দোষটা হইবে সুহাসের—তাহার নহে, দেবরের মনটাও সুহাসের স্মৃতির উপর বিরূপ হইয়া উঠিবে। মেজবৌয়ের মনটা যেন বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল।

কিন্তু বাড়ির উঠানে পা দিতেই তাহার দুই চোখ কপালে উঠিয়া গেল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে! বাড়িতে যেন আনন্দের মেলা বসিয়াছে, সত্য ও কুমুদ দক্ষিণের ঘরে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিয়া চলিয়াছে, স্বামী তাহার পোড়া তামাক ঢালিয়া আবার নূতন করিয়া সাজিতে বসিয়াছেন, মুখখানা তার আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। মেজবৌকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি ভয়ডাই দেখাইছিলে, মেজ বৌ! তাই তো বুলি—বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী—এমনডা কি ক'রে হবি?—স্বরমা রাত্তিরে আ'সে বৌমারে নিয়ে গেছে। আচ্ছা দেখ দেখি পাগলীটার কাণ্ড!—নিয়ে যাবি তো ব'লে যাতি হয়!

উত্তরের ঘরের খোলা জানালার মাঝ দিয়া স্থহাসের আঁচল দেখা যাইতেছে। স্বরমা তাহার পাশে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিয়া চলিয়াছে। মেজবৌকে আসিতে দেখিয়াই সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, বৌদি, কি খাওয়াবেন ক'ন?

মেজবৌ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রথমে একটু থতমত খাইল, তারপর একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিল, কিন্তু তুই ওরে ক'নে পালি?

স্বরমা হাসিয়া বলিল, ক'নে আবার পাব?—এই ঘরেরতে চুরি ক'রে নিয়ে গেছি। বৌ তোমাগারে চুরি করিছি আমি, কিন্তু ঐ কলসীডা নিয়ে গেছেন—আর এক জন।

আর এক জন তখন দক্ষিণের ঘর হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, ওর মিছে কথা শুনবেন না বৌদি—গ্রামের জামাই হয়ে আমি কখনও চুরি করতি পারি?

মেজবৌ কুমুদের কথায় জবাব না দিয়া সরাসরি ঘরে উঠিল, স্বরমা, শোন—তুই যদি ছোটবৌরে নিয়ে গেলি—তয় এ বেড়া ভাঙল কেডা শুনি? মাটি ধ্বসকালো কেডা?

মেজবৌয়ের ইঙ্গিতটা স্থরমা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, তার পর যখন বুঝিল—হাসি আর তার থামিতে চায় না···যেন কেহ একটা জল-ভরা কলসী উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

—হাসিস্ ক্যান্ পোড়ারমুখী ?

পোড়ারমুখী বলিল, রাগ করবেন না বৌদি—এ তা'লি আপনারই কীর্তি। স্থহাস আর কলসীডারে যখন নিয়ে গিছি তখন বেশী রাত্তির তো হয় নেই, আমাগারে বাড়ির সকলেই জানে। এত দিন পাহারা দিছি, কাল ও একলা থাকপি কেমন ক'রে—তাই নিয়ে গেছি। ও ঘরেও তো ঐ কলসীটা ছাড়া জিনিষপত্তর ছিল না। রাত্তিরে ও রাঙা পিসীর কাছে ছিল—তারে জিগ্‌গেসা করলিই জানতি পাবেন।

হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও প্রসঙ্গ এখন ক্রমেই অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সত্য দক্ষিণের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কুমুদও তার পিছু পিছু আসিয়া স্থরমাকে বলিল, এই দিকে আ'সো—বাড়ি চলো।

স্থরমা পোড়ারমুখীর একটুও লজ্জা নাই, সে কুমুদের আহ্বানে আগাইয়া আসিতে আসিতে মেজবৌদির দিকে তাকাইয়া বলিল, কিন্তু যাই বোলেন বৌদি—আপনার বরাত ভাল—বৌ ফিরে পালেন, দেওরের চাকরি হ'ল—এবার আমাগারে মিঠেই মোণ্ডা খাওয়ান—মা দুগ্‌গার ওখানে ষোড়শোপচারে ভোগ দেন—মহাষ্টমী আপনার করাই সাজে।

মেজবৌ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিল, চাকরি আবার ক'নে হ'ল ?

হেমন্ত ঘটানাকে একটু সহজ করিয়া লইতে বলিলেন, তা বুঝি শোন নি ?—শোন্‌বা ক'নতে—সত্য আলি তো তুমি ঘাটে গেলে!

আমাগারে সত্যর বেশ ভাল চাকরি হইছে···পূজোর পরেই যা'য়ে আরম্ভ করবি,—প্রথমেই একেবারে তিরিশ টাকা মাইনে। তুমি এক কাজ কর মেজবৌ—আমি চিনি সন্দেশ আনায়ে দিচ্ছি, তুমি থালা বাসনগুলো একবার জল দে নাও—মার ওখানে ডালা দিতি হবি।

মেজবৌ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, যাই।

উত্তরের ঘরের বারান্দায় কুমুদের অপহৃত কলসীটার উপর রৌদ্র পড়িয়া জ্বল জ্বল করিতেছিল, মেজবৌয়ের ইচ্ছা করিতেছিল ঐ কলসীটা গলায় বাঁধিয়া সে নিজেই একবার ভরা-গাঙের তল কোথা দেখিয়া আসে।